আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়

মতিউর রহমান নিজামী

আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়

মতিউর রহমান নিজামী

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২২৭

৬ষ্ঠ প্রকাশ

শাওয়াল	১৪৩৪
ভাদ্র	১৪২০
সেপ্টেম্বর	২০১৩

বিনিময় ঃ ৯০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ALLAHAR NAYKATTO LAVER UPAY. by Matiur Rahman Nizami. Published by Adhunik Prokashani. 25. Shirishdas Lane. Banglabazar. Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 90.00 Only

দু'টি কথা

বর্তমান বইখানা আমার তিনটি বক্তৃতার সংকলন মাত্র। ইতিপূর্বে আল্লাহর নৈকট্যলাভের উপায়, আত্মশুদ্ধির উপায় এবং জিকির ও দোআর তিনটি বক্তৃতা তিনটি পৃথক পৃথক পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়েছিল। উক্ত তিনটি পুস্তিকার বিষয়বস্তু প্রায় কাছাকাছি এবং একটা আর একটার পরিপূরক হওয়ার কারণে আল হেরা প্রকাশনী এক সাথে সংকলিত রূপে প্রকাশ করেছে। বাস্তব প্রয়োজনে ও পরিমার্জিতভাবে বইটি প্রকাশের জন্য আধুনিক প্রকাশনীকে অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং তারা প্রকাশ করছে। আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্যলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্যে বইটি ফলপ্রসু ও সহায়ক হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

মতিউর রহমান নিজামী
১১-২-৯৭

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রাথমিক কথা	১১
মানব জীবনে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব	১৬
মানব আত্মার পরিচয়	১৯
মানব সত্তার মানগত স্তর	২৩
রাসূলের (সা) মৌলিক কাজ কি কি ?	২৬
আত্মশুদ্ধির লক্ষ্য	২৯
আত্মশুদ্ধির সঠিক ও নির্ভুল পদ্ধতি	৩৬
মো'জিযা ও কারামত	৪৬
আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়	৪৯
আল্লাহর মারেফাত	৫১
আল্লাহর জাত	৫২
আল্লাহর ছিফাত	৫৩
আল্লাহর কুদরতের বর্ণনা	৫৬
আল্লাহর নেয়ামতের গবেষণা	৫৭
আইয়ামুল্লাহ	৫৯
আল্লাহর উলুহিয়াত	৬১
উবুদিয়তের সম্পর্ক রক্ষা করার উপায়	৬৪
জিকির ও দোয়া	৭১
জিকিরের গুরুত্ব	৭১
জিকিরের অর্থ	৭৪
জিকরে কলবী	৭৫
জিকরে লিসানী	৭৬
জিকরে আমলী	৭৬
জিকিরের উপায় ও পদ্ধতি	৭৭
সালাত	৭৭
তেলাওয়াতে কুরআন	৭৮
দোয়া	৭৯
দোয়ার গুরুত্ব	৮১
আল কুরআনের দোয়া	৮৪
রসূলুল্লাহ (সা)-এর দোয়া	৮৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
কতিপয় ব্যবহারিক দোয়া	৯০
আত্মশুদ্ধি ও আত্মসমালোচনা	**৯২**
আত্মসমালোচনার উপায়	৯২
তওবা	৯৪
মুরাকাবা	৯৮

প্রাথমিক কথা

মানুষ কেবলমাত্র দেহ সর্বস্ব জীব নয়। সুন্দর দৈহিক অবয়বের সাথে মহান আল্লাহ তাঁর সেরা সৃষ্টিকে সুন্দর একটি আত্মাও দিয়েছেন। সুতরাং মানুষের উন্নতি-অগ্রগতি, সফলতা ও ব্যর্থতা কেবল দেহের দাবী বা প্রয়োজন মেটানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মাঝে মধ্যে তারা বস্তুবাদী বা জড়বাদী সভ্যতার দিকে অধিকতর ঝুঁকে পড়তে গিয়ে আত্মার চাহিদাকে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু তার পরিণাম কোন দিনই শুভ হয়নি। অতীত দিনের বিভিন্ন জাতির সভ্যতার ধ্বংসের কারণ বিশ্লেষণেও এই সত্যই প্রমাণিত হয়। আধুনিক বিশ্বে জড়বাদী সভ্যতা মানবতা বিধ্বংসী সভ্যতা নামে আখ্যায়িত হতে যাচ্ছে। এ সভ্যতার লীলাভূমি থেকে হিপ্পীদের প্রাচ্যের দিকে ধাবিত হওয়া মূলতঃ জড়বাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে একটি নীরব বিদ্রোহেরই নামান্তর।

মানুষের দৈহিক চাহিদার ন্যায় আত্মিক চাহিদাও যেহেতু ক্রমাগত এবং সহজাত, সুতরাং কোন যুগেই কোন জাতির পক্ষে সম্মিলিতভাবে আত্মার প্রয়োজনকে অস্বীকার করা হয়নি। বরং সর্বকালে সর্বযুগে আত্মিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন ও আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে কোন না কোন প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক সবসময়ই প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। বর্তমানে জড়বাদী সভ্যতার ব্যর্থতার পটভূমিতে মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নীতি-নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি একটা ঝোঁক প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে এই ঝোঁক প্রবণতার মূলে সক্রিয় রয়েছে জীবনের রূঢ় বাস্তবতার কষাঘাতে জর্জরিত মনের চরম হতাশা ও নিরাশা। অতীতে আধ্যাত্মিকতা ও আত্মিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা যারা করেছেন (ইসলামের বাইরে) তারাও অনুরূপ হতাশা নিরাশার পটভূমিতেই এদিকে ঝুঁকে পড়েছেন। তাই তাদের এই ঝোঁক প্রবণতা দেহের প্রয়োজনকে অস্বীকার অথবা উপেক্ষা করেছে। ফলে তাদের আধ্যাত্মবাদের চর্চা গুটিকতক সংসার বিরাগী সাধু-সন্যাসী সৃষ্টি করা ছাড়া বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর জন্য কোন কল্যাণকর অবদান রাখতে পারেনি। বস্তুতঃ মানুষ যেমন দেহ সর্বস্ব নয়, তেমনি আত্মা সর্বস্বও নয়। সুতরাং আত্মাকে উপেক্ষা করে দেহের প্রয়োজন পূর্ণ করার একদেশদর্শী কার্যক্রম যেমন মানবতার জন্যে, মনুষ্যত্বের জন্যে ক্ষতিকর ; তেমনি আত্মার প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে, আত্মার উন্নতি সাধন করতে গিয়ে, দেহের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা, দেহকে শাস্তি দেয়ার প্রক্রিয়া অবলম্বন করাও মানবতার জন্য চরম ক্ষতিকর।

এসব ক্ষেত্রে দেহকে শাস্তি দিয়ে আত্মার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্যে যেসব মনগড়া প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে, তা কোটি কোটি মানুষের মধ্য থেকে হাতে গোণা দু' একজনের পক্ষেই সাধন করা সম্ভব। এ জাতীয় কিছু যোগ-সাধনার মাধ্যমে হাতে গোণা ঐ একজন দু'জন লোক নিজেদের ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে কিছু অসাধ্য সাধন করে সাধারণ মানুষকে বিস্ময়ে হতবাক করে প্রভাবিত করে ফেলে। অবশেষে এই প্রভাবিত লোকেরা অসাধ্য সাধনকারী ব্যক্তিকে অতিমানবীয় কিছু মনে করে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং নিজেদের অভাব-অভিযোগ পূরণের ব্যাপারে তাকে একটা স্বর্গীয় অবলম্বন মনে করে বসে। পরিশেষে এসব ভক্তবৃন্দের ভক্তি-শ্রদ্ধার বাস্তব প্রকাশ ঘটতে শুরু করে নজর-নিয়াজ, ভোগ-শিরনী ইত্যাদির মাধ্যমে। পরিণামে আধ্যাত্মবাদের সাধনা আবার দেহ পূজায় প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহ প্রদত্ত এবং নবী-রাসূলদের (আ) প্রদর্শিত পথ ছাড়া আত্মিক উন্নতি বিধানের চেষ্টা-সাধনার সূচনা ও পরিণাম সর্বযুগে ও সর্বকালে এটাই হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে হতাশাজনিত কারণে মানুষ যেভাবে আবার আধ্যাত্মবাদের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে, তাকে যদি অহীলব্ধ জ্ঞানের ধারায় প্রবাহিত করা না যায় তাহলে এক্ষেত্রে মানুষের চেষ্টা-সাধনা আরেকবার চরমভাবে ব্যর্থ হবে।

দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, আল্লাহ প্রদত্ত ও শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) প্রদর্শিত যে পথে দুনিয়ার মানুষ দেহ ও আত্মার প্রয়োজন যুগপৎভাবে পূরণ করতে সক্ষম, যে পথ অবলম্বন করা দুনিয়ার সর্বস্তরের, সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্যে সহজসাধ্য এবং মানুষের স্বভাব ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল, সেই পথ আজ মানুষের মনগড়া প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি দ্বারা আচ্ছন্ন বিধায় মুসলমানদের কাছেও অপরিচিত। মুসলমানদের সমাজে আধ্যাত্মবাদের যেসব চর্চা ও অনুশীলন আছে তাও একই কারণে বৃহত্তর মানবতার ও মানব গোষ্ঠীর কল্যাণের পথে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারছে না। ইসলাম মানুষের দেহ ও আত্মার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে আত্মিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানের ক্ষেত্রে যে সহজ, সরল ও স্বাভাবিক পদ্ধতি চালু করেছিল তাতে মানুষের মনগড়া পদ্ধতি–প্রক্রিয়া যোগ হওয়ার ফলে ইসলাম মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ তথা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধের উপযোগী যে লোক তৈরী করতে সক্ষম, তা সামগ্রিকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

মুসলিম সমাজে এই আধ্যাত্মবাদের চর্চা ও সাধনার কাজটি ইলমে তাসাউফ নামে পরিচিত। মৌলিকভাবে কুরআনে এই কাজটিকে 'তাযকিয়ায়ে নাফস' বলা হয়েছে। হাদীসে এটাকে 'ইহসান' বলা হয়েছে। ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (র) এটাকে 'আখলাকে ইহসান' সৃষ্টির উপায় নামে অভিহিত করেছেন। রাসূলে করীমের (সা) যামানা থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম সমাজে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যেসব প্রক্রিয়া পদ্ধতির অবলম্বন করা হয়েছে সে

আলোকে আমরা বর্তমানের পরিভাষা অনুযায়ী 'ইল্‌মে তাসাউফ'কে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। এক ঃ নির্ভেজাল ইসলামী তাসাউফ, দুই ঃ নিম ইসলামী তাসাউফ, তিন ঃ গায়ের ইসলামী তাসাউফ।

এক ঃ নির্ভেজাল ইসলামী তাসাউফ বলতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর তরীকা অনুযায়ী সহজ-সরল নিয়মে অর্থাৎ কোন বিশেষ কায়দার যোগ সাধনা ছাড়াই ইসলামের মৌলিক ইবাদতের মাধ্যমে, রাসূল (সা)-এর শিখানো পদ্ধতি অনুযায়ী স্বাভাবিক কাজ-কর্মের মধ্যে আল্লাহর যিকির ও তাসবীহ করা, সালাত, তিলাওয়াত, দোয়া ও হালাল-হারাম বেছে চলা প্রভৃতির মাধ্যমে নাফসের তাযকিয়া করে সাহাবায়ে কেরাম (রা) যে 'আখলাকে ইহসানের' অধিকারী হতেন সেটাকেই বুঝান হয়। খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন তথা সমস্ত আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীন এই নির্ভেজাল তাসাউফের অনুসারী ছিলেন। এটাই সঠিক তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধির নির্ভুল পথ। আল কুরআন যাকে 'তাযকিয়ায়ে নাফস' নামে অভিহিত করেছে। আমাদের ঈমানের দাবী, বর্তমান মুহূর্তের বিশ্বমানবতার দাবী, আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে শেষ নবী (সা)-এর 'উসওয়ায়ে হাসানার' অবলম্বনে এই খাঁটি ও নির্ভেজাল ইসলামী তাসাউফকে পুনর্জীবিত করতে হবে।

দুই ঃ নিম ইসলামী তাসাউফ বলতে ইসলামী শরীয়তের সীমার মধ্যে অবস্থান করে আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে ভারতীয় যোগী-ঋষি তথা গ্রীক দর্শনের ভিত্তিতে কিছু যোগ আসন জনিত প্রক্রিয়া পদ্ধতির সংযোজনকে বুঝায়। এ ক্ষেত্রে তৌহিদ বর্জন ও শিরক অবলম্বন যারা করেননি বরং এই প্রক্রিয়াসমূহের মাধ্যমে খাওফে খোদা, হোব্বে রাসূল ও ফিকরে আখেরাত সৃষ্টিকেই প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন, কেবল তাদের তাসাউফকেই নিম ইসলামী তাসাউফ বলা যায়। খাওফে খোদা, হোব্বে রাসূল এবং ফিকরে আখেরাত লক্ষ্য হওয়া সত্ত্বেও এদের তাসাউফ চর্চাকে নিম ইসলামী বলার কারণ এই যে, এ ক্ষেত্রে রাসূলের শিক্ষার সাথে কোন কিছুর যোগ বিয়োগের অবকাশ নেই। তাছাড়া যোগ বিয়োগ কল্যাণকরও হতে পারে না। আল্লাহর নৈকট্যলাভের ব্যাপারটা আল্লাহ এবং রাসূলের চেয়ে অন্য কেউ বেশী বুঝতে পারে না। সুতরাং নিয়তে ইখলাস থাকলেও অনুরূপ পদক্ষেপ সীমা লংঘনের সামিল হওয়ার কারণে কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ হতে পারে না। এই তাসাউফের উদ্যোক্তারা যা চেয়েছেন বাস্তবে তা পাননি। গুটিকতক লোক আধ্যাত্মিক জগতে উৎকর্ষ সাধন ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও দ্বীনকে বিজয়ী করবার লক্ষ্যে নবী (সা) যেরূপ লোক তৈরী করেছেন এদের সাধনা (কিছু লোক তৈরী ও কিছু দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দিলেও) তার ধারে কাছেও যেতে পারেনি। এই

তাসাউফ থেকে বাইরের সংযোজিত প্রক্রিয়াসমূহ বাদ দিয়ে সংশোধন করে খালেস ইসলামী তাসাউফে পরিণত করা যেতে পারে। এই ময়দানে যারা এখলাসের সাথে নিয়োজিত এবং অগ্রসর, তাদের সাথে কুরআন এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে 'তাযকিয়ায়ে নাফসের' আসল রূপ, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি নিয়ে খোলা মনে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এর সংশোধন ও সংস্কারের কাজটি আঞ্জাম দেয়া সম্ভব কিনা তা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে 'ইসলামী তাসাউফের' বাস্তব ও জীবন্ত নজীর উপস্থাপনের জন্য আল্লাহর কিছু নেক বান্দাকে, কিছু মর্দে মু'মিন ও মর্দে মুজাহিদকে এগিয়ে আসতে হবে।

তিন ঃ আত্মশুদ্ধির ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের নামে গায়ের ইসলামী প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে গিয়ে যারা ইসলামী শরীয়তের সীমা লংঘন করছে, শিরক ও বিদআতের জন্ম দিয়েছে, এমনকি দুনিয়ার সামনে ইসলাম ও মুসলমানকে একটা তামাশার বস্তু বানিয়েছে, আল্লাহর কিছু প্রিয় বান্দাদের মাজারকে (যারা বেঁচে থাকতে শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছেন) গাঁজার আসর ও কাওয়ালীর নামে ন্যাংটা নাচের আখড়া বানিয়েছে, যারা মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে ধর্মের নামে দুনিয়া বানাচ্ছে, তাদের তাসাউফ সম্পূর্ণরূপে গায়ের ইসলামী—যার মূলোৎপাটন অপরিহার্য।

'খালেস ইসলামী তাসাউফ' কোনটা এ ব্যাপারে প্রশ্ন উঠাবার আসলে তেমন কোন অবকাশ ইসলামী শরীয়তে নেই। আমরা উল্লেখ করেছি, আজ মুসলমানদের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক অনুশীলনকে 'ইলমে তাসাউফ' বলা হয়, আল কুরআনে সেটাকেই 'তাযকিয়ায়ে নাফস' বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কুরআন এটাকে মানুষের সফলতার একমাত্র উপায় হিসেবে উপস্থাপন করেছে। বলা হয়েছে ঃ

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝ (الشمس : ٨ - ٩)

"মানুষের আত্মার শপথ আর শপথ সেই সত্ত্বার যিনি মানুষের আত্মাকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন, অতপর তাকওয়া ও ফিসক ফুজুরের অনুভূতি ও বিচার শক্তি দিয়েছেন। মানুষের মধ্য থেকে যারা এই নাফস বা আত্মার 'তাযকিয়া' করে তারাই সফলকাম হয়। (আর যারা এই আত্মার খোদা প্রদত্ত বিচার শক্তিকে) অবদমিত করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হয়।"

আল্লাহ কুরআনে 'তাযকিয়ায়ে নাফসকে' একটা মৌলিক কাজ হিসেবে পেশ করেছেন। শুধু তাই নয়, এটাকেই মুহাম্মদ (সা)-এর অন্যতম প্রধান কাজ হিসেবে অভিহিত করেছেন। বেশ কয়েকটি স্থানে এভাবে নবী (সা)-এর কাজের বর্ণনা এসেছে ঃ

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ايٰتِهٖ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق

"আর তিনিই আল্লাহ, যিনি উম্মী লোকদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন যিনি তাদেরকে তিলাওয়াত করে শোনান তাঁর বাণী, তাদের তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধি কল্পে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত।"—(সূরা আল জুমুআ ঃ ২)

এখানে রাসূলের কাজ হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে * তিলাওয়াতে আয়াত * তাযকিয়ায়ে নাফস এবং * তালীমে কিতাব ও হিকমত। একথাগুলো তিনটি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহর কুরআন সাক্ষী, লক্ষ লক্ষ সাহাবায়ে কেরাম সাক্ষী, সাক্ষী দুনিয়ার ইতিহাস, শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) তাঁর উপরে অর্পিত সব দায়িত্বই ঠিকমত পালন করেছেন। বিদায় হজ্জের ভাষণের মাধ্যমে তিনি লক্ষাধিক সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে একথার স্বীকৃতিও নিয়েছেন। সুতরাং 'তাযকিয়ায়ে নাফসের' ক্ষেত্রে তিনি তাঁর দায়িত্ব পুংখানুপুংখরূপে পালন করেছেন, এতে কোন মুসলমানের মনে সন্দেহ-সংশয় থাকতে পারে না। অন্য কথায় সন্দেহ পোষণ করে মুসলমান থাকা যায় না। সুতরাং ঈমান এবং বুদ্ধিমত্তা উভয়ের দাবী হল, 'তাযকিয়ায়ে নাফসের' এই গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কাজটি রাসূলে পাক (সা) কিভাবে, কোন্ পদ্ধতিতে আঞ্জাম দিয়েছেন এবং উক্ত পদ্ধতি-প্রক্রিয়ায় কোন্ ধরনের লোক তৈরী হয়েছে, তারা এভাবে তৈরী হবার পর ইসলামের এবং মানবতার কোন্ কাজে লেগেছেন, তা জানবার এবং বুঝবার চেষ্টা করা আর নবীর একজন নিষ্ঠাবান উম্মত হিসেবে এ ক্ষেত্রে একমাত্র নবী (সা)-এর প্রদর্শিত পদ্ধতিকে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল মনে করে হৃদয়ের ঐকান্তিকতা সহকারে তা গ্রহণ করা।

রাসূলে খোদা (সা)-এর অন্যান্য তালীমাত যেমন প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট, তেমনি তাযকিয়ায়ে নাফসের ব্যাপারটিও সুস্পষ্ট। এতদসত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে রাসূলে খোদার (সা) তালীম উপেক্ষা করে তাতে সংযোজনের সূচনা ও অনৈসলামী প্রক্রিয়ার অনুপ্রবেশ কেন ঘটল সে ব্যাপারটা দুর্বোধ্য। এই ক্ষেত্রে আমি অহেতুক কারো সমালোচনা করতে চাই না, কাউকে হেয়প্রতিপন্ন করতে চাই না। খালেছ নিয়তে নিজের আমলের প্রয়োজনে এবং সাধারণ মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত, রাসূল (সা) প্রদর্শিত সেই সহজ পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করার মানসে এ বিষয়ে কলম ধরতে বাধ্য হয়েছি। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবের এবং তাঁর নবীর সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান দান করে আমাকে সাহায্য করুন, আকুল ব্যাকুল মনে এই দোয়ার মাধ্যমে এ ময়দানে যাত্রা শুরু করতে চাই।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

মানব জীবনে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব

মানুষের জীবনে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব বিচার করতে গেলে প্রথমে মানুষের পরিচয় এবং মানব সত্ত্বার যথার্থ মূল্যায়ণ করা অপরিহার্য। মানুষের পরিচয় বলতে গেলে সংক্ষেপে বলতে হয়—মানুষ এই দুনিয়ায় আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। দুনিয়ায় সে কিছুদিন অবস্থান করবে, কিছু নিয়ামত ভোগ করবে, এরপর তাকে ফিরে যেতে হবে তার মহান মুনিবের কাছে। ফিরে গিয়ে তাকে হিসেব দিতে হবে, দুনিয়ার জীবনে সে আল্লাহর খলিফা হিসেবে তাঁর মর্জি পূরণে কতটা সফলকাম হয়েছে অথবা ব্যর্থ হয়েছে।

স্মরণযোগ্য, আল্লাহর সৃষ্টি জগতে মানুষ ছাড়া আর সবকিছু আল্লাহর হুকুম মেনে চলছে—মেনে চলতে বাধ্য। এর ব্যতিক্রম মানুষের জীবনে এবং সমাজে আল্লাহর আইন ও আল্লাহর হুকুম-আহকাম জারি করার, কার্যকর করার দায়িত্বভার মানুষের উপর। আর মানুষ আল্লাহর খলিফা এই অর্থেই যে, খোদা মানুষকে এই স্বাধীনতা দান করেছেন, তিনি এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার এবং অপব্যবহারের প্রতিদান, প্রতিফল ও পরিণাম-পরিণতি সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল করেছেন। আল্লাহ মানুষের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُورًا ۝

"মানুষের কাছে আমি দু'টি পথ তুলে ধরেছি, একটি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ও আনুগত্যের পথ। আর অপরটি কুফরী এবং নাফরমানীর পথ।"–(সূরা আদ দাহর ঃ ৩)

এরপর কুফরীর পরিণাম সম্পর্কে বলেছেন ঃ

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِينَ سَلٰسِلَا وَأَغْلٰلاً وَّسَعِيرًا ۝ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَاسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝

"আমি কাফেরদের জন্যে তৈরী করে রেখেছি লোহার শিকল, কণ্ঠকড়া ও দোযখের আগুন। আর নেক লোকেরা বেহেশতে সুপেয় পানীয় দ্বারা আপ্যায়িত হবে—যাতে মিশান থাকবে সুগন্ধিযুক্ত কর্পূর। এটা হবে একটা প্রবাহিত ঝর্ণাধারা, যার পানি থেকে আল্লাহর বান্দাগণ শরাব পান করবে, যেখানে যেভাবে চায় এর শাখা-প্রশাখা খুলতে পারবে।"

–(সূরা আদ দাহর ঃ ৪-৬)

বস্তুত মানুষের জন্যে আল্লাহর পথের অনুসরণ করে চলা এবং তাদের নিজেদের মনগড়া পথের অনুসরণ করে চলার মধ্যে যে স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগের সুযোগ জনিত স্বায়ত্বশাসনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, এটা মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালার একটি বিরাট আমানত। এই আমানত সম্পর্কে কুরআন বলছে ঃ

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ○ لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

"আমি এই আমানত পেশ করেছিলাম আসমান, জমীন ও পাহাড় পর্বতের প্রতি, তারা এই আমানতের বোঝা বহন করতে অস্বীকার করে এবং ভীত কম্পিত হয়ে পড়ে। মানুষ এ আমানতের বোঝা বহন করল। এখন তারা সে কথা দিব্যি ভুলে গিয়ে জুলুমে নিমজ্জিত আছে। আল্লাহ এরূপ করেছেন, মুনাফেক ও মুশরিক নারী-পুরুষদের শাস্তি দিবার জন্যে এবং মু'মিন নারী-পুরুষদের তওবা কবুল করার জন্যে। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।"-(সূরা আল আহযাব ঃ ৭২-৭৩)

মানুষ যে স্বেচ্ছায় আল্লাহ তা'য়ালার নিকট থেকে এই কঠিন আমানত নিয়ে এসেছে, মানুষের আত্মাই তার সাক্ষী। আল্লাহ মানুষের আত্মাকে এই আমানতের যথার্থ সদ্ব্যবহারের যোগ্যতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। মানুষের আত্মাকে ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে বাছ-বিচার করে চলার শক্তি আল্লাহ তায়ালা জন্মগতভাবেই দিয়ে দিয়েছেন। সেই জন্যেই কুরআন দাবী করেছে মানুষের আত্মাকে আল্লাহ তা'য়ালা একটা পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন। কুরআন বলে ঃ

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝

"মানুষের আত্মার শপথ আর শপথ সেই সত্ত্বার যিনি মানুষের আত্মাকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন, অতপর তাকওয়া ও ফিসক ফুজুরের অনুভূতি ও বিচার শক্তি দিয়েছেন। মানুষের মধ্য থেকে যারা এই নাফ্স বা আত্মার 'তাযকিয়া' করে তারাই সফলকাম হয়। (আর যারা এই আত্মার খোদা প্রদত্ত বিচার শক্তিকে) অবদমিত করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হয়।"

-(সূরা আশ শামস ঃ ৭-১০)

কুরআন আরো বলে ঃ

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط

"সেই স্বভাব ধর্মের অনুসরণ কর, যে স্বভাব ধর্মের উপর মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"–(সূরা আর রূম ঃ ৩০)

হাদীসে রাসূলে বলা হয়েছে, প্রত্যেক মানব সন্তান স্বভাব ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতপর তাদের পিতামাতার কারণেই তারা ইয়াহুদী, খৃস্টান অথবা অগ্নিপূজক হয়ে থাকে।

মানব আত্মার পরিচয়

উপরের আলোচনার সূত্র ধরে আমরা মানুষের সত্ত্বার আসল পরিচয় জানতে পারি। আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি, মানুষ কেবল দেহ সর্বস্ব জীব নয়। আবার কেবল আত্মা সর্বস্বও নয়। সুতরাং দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানুষের যে সত্ত্বার বিকাশ ঘটে, এটাই প্রকৃত মানুষ। কাজেই মানুষের পরিচয় ভালভাবে উপলব্ধি করতে হলে মানুষের এই পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সত্ত্বার মূল্যায়ণ করা একান্তই অপরিহার্য। দৈহিক ও আত্মিক চাহিদার ভিত্তিতে গড়ে উঠা মানব সত্ত্বাকে আমরা দু' ভাগে ভাগ করতে পারি। তার সত্ত্বার একটা দিক হলো জৈবিক দিক আর অপর দিকটা হলো নৈতিক দিক। এভাবে মানুষকে আমরা দ্বৈত সত্ত্বার অধিকারী বলেও অভিহিত করতে পারি। জৈবিক সত্ত্বা বলতে অন্যান্য পশু প্রাণীর যেমন কিছু পাশবিক চাহিদা আছে, কিছু জৈবিক প্রয়োজনের অনুভূতি আছে, মানুষ এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের এসব চাহিদা ও প্রবণতা পশু শক্তিকেও হার মানায়। মানুষ ব্যতিক্রম এই দিক দিয়ে যে, এই জৈবিক বা পাশবিক চাহিদাকে নিয়ন্ত্রিত করে গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করার মত একটা সত্ত্বাও তার আছে। এই সত্ত্বা বলতে বুঝায়, আল্লাহ প্রদত্ত সেই সহজ বিবেক-বুদ্ধিকে—যার দ্বারা মানুষ ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে বিচার-বিশ্লেষণ করে মন্দকে পরিহার করে ভালটাকে গ্রহণ করতে পারে। অন্যায়কে বর্জন করে সত্যকে গ্রহণ করতে পারে। মানব সত্ত্বার এই দিকটাকেই আমরা নৈতিক সত্ত্বা নামে অভিহিত করেছি।

মানুষ যদি স্বীয় সাধনা বলে নৈতিক সত্ত্বার উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে তার জৈবিক ও পাশবিক সত্ত্বার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে তাহলে সে হয় আল্লাহর সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি। 'আহসানে তাকবিম'-এর স্বার্থকতা প্রমাণিত হয় তার মাধ্যমে। 'লাকাদ কাররামনা বানি আদামা'-এর বাস্তব প্রকাশ ঘটে তার মাধ্যমে। পক্ষান্তরে, কারো কৃতকর্মের ফলে যদি মানুষের এই আল্লাহ প্রদত্ত নৈতিক সত্ত্বা অবদমিত হয়, পরাভূত হয় পাশবিক সত্ত্বার কাছে, তাহলে সেই মানুষ হয় পশুর সমান বরং তার চেয়েও অধম ও নিকৃষ্ট। 'আসফালা সাফিলীন' -এর পর্যায়ভুক্ত হয় সে।

আমরা এই সংক্ষেপ আলোচনার মাধ্যমে যে জিনিসটি বুঝাতে চাচ্ছি, তাহলো—মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্যে, মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে মানুষের নৈতিক সত্ত্বার বিকাশ সাধন। অন্য কথায় আধ্যাত্মিক সাধনা বা আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা একান্তই

অপরিহার্য। এটা অপরিহার্য যেমন মানুষের স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধির আলোকে, তেমনি এটাকে অপরিহার্য করে দিয়েছেন মানুষের স্রষ্টাও।

এবার প্রশ্ন উঠে, মানুষের এই নৈতিক সত্তার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের উপাদান গ্রহণ করা হবে কোথা থেকে? এক্ষেত্রে আত্মশুদ্ধি বা 'তাযকিয়ায়ে নাফসের' চেষ্টা-সাধনায় কার গৃহীত নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করা সমীচীন হবে, আর কারটা সমীচীন হবে না তাও আমাদের সামনে পরিষ্কার হওয়া অপরিহার্য।

এক্ষেত্রে বলতে চাই, যদিও মানুষকে আল্লাহ তায়ালা জন্মগতভাবে ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচার শক্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন, তবুও কেবলমাত্র সেই বিচার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সফলতা অর্জন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের উপায়-উপাদান যেভাবে এই মাটির পৃথিবীতেই ছড়িয়ে আছে, নৈতিক চাহিদা পূরণের উপাদান সেভাবে নেই। আল্লাহ সমস্ত বস্তুগত উপাদানকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ـ

"(হে মানুষ!) এই পৃথিবীর সবকিছুকেই (আল্লাহ তায়ালা) তোমাদের অধীন ও অনুগত করে দিয়েছেন।"–(সূরা জাসিয়া ঃ ১৩)

সুতরাং পৃথিবীর বস্তুশক্তির ব্যবহার করে মানুষ স্বীয় চেষ্টা-সাধনা দ্বারা তার জৈবিক ও পাশবিক সত্তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, এটাকে তার ইচ্ছামত উন্নত করতে পারে। যেমন তার পেটের ক্ষুধা মিটাবার উপাদান এই মাটির পৃথিবী থেকে সে সংগ্রহ করতে পারে। রোগ-ব্যধি থেকে মুক্তির উপাদান, বাসস্থান গড়ে তোলার উপাদান, যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তির উপাদান প্রভৃতি মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নয়, তাই সে নিজের চেষ্টা-সাধনায় এগুলোকে আয়ত্বে আনতে পারে। আর আনছেও।

এভাবে বস্তুকে ব্যবহার করার জ্ঞানটাও খোদা প্রদত্ত। খোদা প্রদত্ত এই জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ বস্তুর ধর্ম আবিষ্কার করে বিজ্ঞানের সাধনায় দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। সে গ্রহান্তরে পাড়ি জমাচ্ছে। এভাবে আরো বহুগুণে মানুষের এ পথের অভিযান এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু মানুষের মত জীবনযাপন, 'আশরাফুল মাখলুকাতের' মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া তার নিজস্ব পথে কিছুতেই সম্ভব নয়। তাইতো দেখা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষের সাথে সাথে মানুষের সমাজ থেকে মানবতা ও মনুষ্যত্ব লোপ পাচ্ছে। পক্ষান্তরে পাশবিকতা ও অমানবিকতার অভিশাপ গ্রাস করছে গোটা পৃথিবীকে। পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষকে এই অভিশাপের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি দিতে পারে কেবল দুনিয়া আখেরাতের

স্রষ্টাই। মুক্তি নিহিত কেবল তাঁর দেয়া বিধানে, নবী-রাসূলের পথে। মানুষের নৈতিক সত্ত্বার বিকাশ সাধনের উপাদান আল্লাহ মাটির পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখেননি যে, মানুষ নিজেদের চেষ্টা-সাধনা বলে তা আয়ত্ব করে সফলতা অর্জন করবে। এ সত্ত্বার বিকাশলাভের উপাদান তিনি মানুষকে অবশ্যই দিয়েছেন, কিন্তু সেভাবে নয়, যেভাবে বস্তুজগতের উপাদান বস্তুজগতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে এই উপাদান মানুষকে দান করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

فَاِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ○

"অতপর আমার পক্ষ থেকে হেদায়াত আসবে, যারা এর অনুসরণ করবে তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবারও কোন কারণ নেই।"
-(সূরা আল বাকারা ঃ ৩৮)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সর্বশেষ নবী (সা)-এর মাধ্যমে আমাদের নৈতিক সত্ত্বার উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজনীয় উপাদান পাঠিয়েছেন। সুতরাং নবী (সা) তার সময় থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সব মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের একমাত্র অনুসরণযোগ্য শিক্ষক। একমাত্র তাঁর প্রদর্শিত ও অনুসৃত পথ ও পদ্ধতিতেই আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন বা আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা সফল হতে পারে।

আমরা সূচনায় বুঝাবার চেষ্টা করেছি যে, মানুষের মনগড়া পদ্ধতি মূলতঃ অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম। এ অধ্যায় এসে প্রমাণিত হচ্ছে, নবী-রাসূলগণ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তাই সহজ-সরল, স্বাভাবিক এবং মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং সর্বস্তরের, সর্বশ্রেণীর মানুষের পক্ষেই এটা গ্রহণযোগ্য এবং অনুসরণীয়। এখানে আর একটা কথাও পরিষ্কার হওয়া দরকার–মানুষের মনগড়া পদ্ধতিতে যেসব আধ্যাত্মিক সাধনা হয়েছে সেখানে মনুষ্যত্ব বা মানবতা নয় বরং কিছু লোকের অতিমানবীয় কিছু কলাকৌশলের অধিকারী হওয়াকেই সাধনার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে মনে করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, খোদা প্রদত্ত এবং রাসূল (সা) প্রদর্শিত পদ্ধতিতে পরিচালিত আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টার লক্ষ্য হয় স্রষ্টার দাসত্ব, আনুগত্য ও সৃষ্টির সেবা করার মত যোগ্যতা অর্জন করা। এ পথে সাধনার ফলে যারা যত বেশী আল্লাহর হুকুম মানার এবং তার নিষিদ্ধ জিনিস ও কাজ বর্জন করার যোগ্য হয়, প্রকৃতপক্ষে সেই ততবেশী কামিয়াব বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এখানে কোন অলৌকিক কিছু ঘটনা আদৌ কোন বিবেচনার বিষয় হিসেবে

গুরুত্ব পায় না। তাই বলে অলৌকিকতাকে অস্বীকার করা হচ্ছে না। অলৌকিকতা যে কোন লোকের ব্যাপারেই ঘটতে পারে এবং সে জন্য কোন ব্যক্তির কৃতিত্ব মোটেই আলোচ্য বিষয় হবার যোগ্য নয়। এমন কিছু ঘটলে, তো আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘটবে। একজন সর্বোচ্চমানে উন্নীত ব্যক্তির জীবনে কোন অলৌকিক কিছুর প্রকাশ নাও ঘটতে পারে। আবার আল্লাহ চাইলে একজন মামুলী মানুষের জীবনেও কোন অস্বাভাবিক কিছুর প্রকাশ ঘটতে পারে। খাঁটি ইসলামী তাসাউফের দৃষ্টিতে এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বরং ইলমে কালামের দৃষ্টিতে ইচ্ছা করে কারামাত প্রদর্শনকে এসতেদরাজ বলা হয় এবং যারা এরূপ করে তাদেরকে ফাসেক নামে আখ্যায়িত করা হয়।

মানব সত্ত্বার মানগত স্তর

আত্মশুদ্ধি ও তাযকিয়ায়ে নাফসের পদ্ধতি আলোচনার আগে মানব আত্মার মানগত স্তর সম্পর্কেও কিছু আলোকপাত করা জরুরী মনে করি। আত্মার উন্নতি ও উৎকর্ষের মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে এটা সহায়ক হতে পারে। আল কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের আত্মা আমলের ভিত্তিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করে থাকে।

জন্মগতভাবে মানুষের আত্মা যেভাবে যে অবস্থায় এ দুনিয়ায় আসে কুরআনের আলোকে আমরা এটাকে 'নাফসে মুলহামা' নামে অভিহিত করতে পারি।

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۙ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۙ

"মানুষের আত্মার শপথ, আরো শপথ সেই মহান সত্ত্বার, যিনি মানুষের নাফসকে পূর্ণ রূপ দিয়েছেন এবং তাকে ফিসক-ফুজুর ও তাকওয়ার জ্ঞান দিয়েছেন।"-(সূরা আশ শামস ঃ ৭-৮)

এখানে 'আলহামাহা' এলহাম থেকে। যে এলহাম প্রাপ্ত তাকে 'মালহামা' নামে অভিহিত করতে পারি। এই আয়াতের আলোকেই সিরাতুল মুস্তাকীমের বর্ণনা সংক্রান্ত একটি হাদীসে আত্মার এই অবস্থার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় —'একটি পথের দুই পাশের খোলা দরজাসমূহে পর্দা লটকানো রয়েছে। মানুষ এই পথে যাত্রা শুরু করার মুহূর্তে একজন সতর্ককারী তাকে সতর্ক করে বলে, সোজাসুজি যাবে, ডানে বাঁয়ে ঢুকতে চেষ্টা করবে না। অতপর পথিক পথ চলতে চলতে ডানে বাঁয়ে উঁকি-ঝুঁকি দেয়, লটকানো পর্দায় হাত দিয়ে ভিতরে ঢুকতে উদ্যোগ নেয়। এমন সময় আর একজন সতর্ককারী তাকে বাধা দেয়।' অতপর রাসূলে খোদা (সা) ব্যাপারটা আর একটু খুলে বললেন—পথ হলো ইসলাম, খোলা দরজা হল আল্লাহর ঘোষিত হারামসমূহ, পর্দা হলো আল্লাহর দেয়া সীমারেখা। পথিক মানুষ বা মুসলমান, প্রথম সতর্ককারী কুরআন আর দ্বিতীয় সতর্ককারী মানুষের মনের মাঝে অবস্থিত ওয়ায়েজ। অর্থাৎ খোদা প্রদত্ত বিবেক-বুদ্ধি, যাকে আল্লাহ শক্তি দিয়েছেন ভালকে গ্রহণ করার ও খারাপ কাজকে বর্জন করার।

'নাফসে মালহামা' মানবাত্মার মূল অবস্থা। সাধনার পর এটা উন্নত হয়ে এমন পর্যায়ে যেতে পারে, যখন মানুষ আল্লাহর হুকুম-আহকামের উপর চলতে গিয়ে চরম ও পরম তৃপ্তি লাভ করবে। পরিপূর্ণ শান্তি ও তৃপ্তির সাথে আল্লাহর হুকুম-আহকাম মেনে চলবে। মনে কোন রূপ সন্দেহ-সংশয়ই স্থান পাবে না।

আল্লাহর হুকুম পালন, আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচা ও পুরস্কার পাওয়ার কামনা, খাওফে খোদা, হোব্বে রাসূল ও ইত্তেবায়ে রাসূল, সেই সাথে ফিকরে আখেরাত হয় এদের পথের একমাত্র পাথেয়। এর বাইরের আর কোন কিছুই তাদের চাওয়া-পাওয়ার থাকে না। আত্মার এই সর্বোচ্চ স্তরকে কুরআন 'নাফসে মুতমায়িন্নাহ' নামে অভিহিত করেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ

"হে পরিতৃপ্ত আত্মা ! ফিরে এসো তোমার রবের সমীপে—খুশী মনে, সন্তুষ্টচিত্তে। অতপর আমার বান্দা, আমার অনুগত বান্দাদের মধ্যে শামিল হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর।"—(সূরা আল ফাজর ঃ ২৭-৩০)

আত্মার উন্নতি বিধানের ক্ষেত্রে এটাই হলো সর্বোচ্চ স্তর। অনেকের মতে আম্বিয়ায়ে কেরামের নাফসই নাফসে মুতমায়িন্না। কারণ, তারা মা'সূম। আমাদের পক্ষে পুরোপুরি এ স্তরে পৌঁছা সম্ভব নয়। এখানে আমার মতে আম্বিয়ায়ে কেরাম যে পর্যায়ে 'মুতমায়িন্না' স্তরে উন্নীত, সেই পর্যায়ে তো অন্যদের পৌঁছা সম্ভব নয়, এটা অবশ্যই ঠিক কথা। কারণ, তারা আল্লাহ তাআলার যেসব আয়াতসমূহ প্রত্যক্ষ করেছেন বা আল্লাহ করিয়েছেন, সেগুলো সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। রাসূলের (সা) কিছু উম্মত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে এবং নবীদের (আ) মধ্যে নবুয়তের দরজা বা মরতবা ছাড়া কোন পার্থক্য থাকবে না ও কিছু উম্মতের মর্যাদা অন্যান্য নবীদের জন্যেও ঈর্ষার কারণ হবে। এসব বক্তব্যের আলোকে সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে কিছু লোকের নাফসে 'মুতমায়িন্নার' স্তরে উন্নীত হতে পারাকে অসম্ভব মনে করার কোন যৌক্তিকতা নেই। এ স্তরে উন্নীত ব্যক্তিদের মধ্যে নবী ও অনবীদের মধ্যে একটা বিরাট তারতম্য যে থাকবেই সেটাতো একান্তই স্বাভাবিক। মানুষের সাধনার লক্ষ্য হবে আত্মাকে এই স্তরে উন্নীত করা।

'নাফসে মুলহামা'র নীচের স্তরে আত্মার দু'টো অবস্থা হয়ে থাকে। এর একটাকে বলা হয়েছে, 'নাফসে লাওয়্যামা'—তিরস্কারকারী আত্মা। মানুষ মানবীয় দুর্বলতা বশত ভুলবশত কোন খারাপ কাজ করে ফেললেই তার মধ্যে বিবেকের দংশন শুরু হয়ে থাকে। তার বিবেক তার মধ্যে একটা অনুতাপ অনুশোচনার ভাব সৃষ্টি করে থাকে। 'নাফসে মুলহামার' ক্ষেত্রে মানুষ মনে খারাপ কাজের ইচ্ছা সৃষ্টি হবার বা খারাপ কাজে হাত দেবার মুহূর্তেই ভিতর থেকে বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে। খারাপ কাজের চিন্তা মাঝে মাঝে মনে অবশ্যই সৃষ্টি হয়ে থাকে, কিন্তু উক্ত খারাপ কাজে লিপ্ত হবার মুহূর্তে সবসময় সে একটা

প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকে। উপরে সিরাতুল মুস্তাকীমের উদাহরণ সম্পর্কীয় হাদীসেও এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই ছুফিয়ায়ে কেরামের মধ্যে একটা পরিভাষা চালু আছে 'আম্বিয়ায়ে কেরাম মা'সুম' আর 'আওলিয়ায়ে কেরাম মাহফুজ'। কিন্তু লাওয়্যামার ক্ষেত্রে খারাপ কাজ তার দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায়। আফসোস, অনুতাপ আর অনুশোচনা হয় পরে।

লাওয়্যামারও নীচের স্তরকে বলা হয় নাফসে আম্মারা। এ পর্যায়ে নেমে এসে মানুষের আত্মা বিবেকের অনুভূতিটুকু হারিয়ে ফেলে। খারাপ কাজ তখন তার স্বভাবের অংশ হয়ে যায়। এবং এতে তার মনে কোন অনুতাপ অনুশোচনা কখনই অনুভূত হয় না। এই স্তরে এসে মানুষ হয়ে যায় পশুর সমান বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট।

রাসূলের (সা) মৌলিক কাজ কি কি ?

আল কুরআনের ঘোষণা মুতাবেক রাসূলের (সা) মৌলিক কাজ ছিল তিনটি ঃ

১। তিনি মানবজাতির নিকট আল্লাহর কিতাব উপস্থাপন করেছেন, তাদেরকে আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন।

২। উক্ত কিতাবের আলোকে যাবতীয় কার্যক্রম আঞ্জাম দেবার পথ, পন্থা ও কর্মকৌশল তথা প্রয়োগ-বুদ্ধির শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়েছেন।

৩। তিনি ইসলামী সমাজের উপযোগী ব্যক্তি গঠন করেছেন, ব্যক্তিদের চরিত্র গঠন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের প্রয়াস চালিয়েছেন। সেই সাথে সমাজের সামষ্টিক পরিবেশও পূত-পবিত্র করার এবং মার্জিত পরিশীলিত মানে উন্নীত করার চেষ্টা করেছেন।

পবিত্র কুরআনের চারটি স্থানে আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত তিনটি মৌলিক কাজের কথা এভাবে আলোচনা করেছেন ঃ

নিম্নোক্ত আয়াতে নবী মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোআর উদ্বৃতি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা সেই মুহূর্তের কথা স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আ) এই ভাষায় দো'আ করলেন ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط

"হে আমাদের পরোয়ারদিগার ! তুমি তাদের মধ্যে এমন একজন রাসূল পাঠিও যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, যিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমাতের তালীম দিবেন এবং তাদের তাযকিয়া করবেন।"—(সূরা আল বাকারা ঃ ১২৯)

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ط

"যেমন আমরা তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছি। যিনি তোমাদেরকে আমাদের আয়াত পাঠ করে শুনান, তোমাদের আত্মসংশোধন ও উন্নতি বিধানের চেষ্টা করেন, তোমাদেরকে

কিতাব ও হিকমাতের দীক্ষা দান করেন, আর সেই সব ব্যাপারেও শিক্ষা দান করেন, যে ব্যাপারে তোমরা কিছুই জানতে না।"

—(সূরা আল বাকারা ঃ ১৫১)

প্রথমোক্ত আয়াতের মাধ্যমে শেষ নবীর মৌলিক কাজ কি কি হবে সে সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একটি দো'আর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অবহিত করেছেন। বর্তমান আয়াতের মাধ্যমে রাসূল (সা) বাস্তবে যেসব মৌলিক কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন তারই উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ج

"আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের উপর বড় মেহেরবানী করেছেন, তাদেরই মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়ে, যে তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শুনায়, তাদের তাযকিয়া করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়।"—(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৪)

উক্ত আয়াতেও মূলতঃ রাসূলের মৌলিক তিনটি কাজকে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, বাস্তবে তিনি উল্লেখিত কাজগুলোই আঞ্জাম দিয়েছেন।

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٢

"তিনিই সেই মহান সত্ত্বা, যিনি উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শুনান, তাদের তাযকিয়া করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দান করেন। অথচ এর পূর্বে তারা সুস্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।"—(সূরা আল জুমআ ঃ ২)

এ আয়াতের মাধ্যমেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর শেষ নবীর মৌলিক তিনটি কাজের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন যে, বাস্তবে তিনি এই কাজগুলো আঞ্জাম দিয়েছেন।

•

উল্লেখিত চারটি আয়াতের মাধ্যমে আমরা মূলতঃ আল্লাহর রাসূলের তিনটি মৌলিক কাজের উল্লেখ পাই প্রায় এক ও অভিন্নভাবে। পার্থক্য কেবল এতটুকুই যে, প্রথমোক্ত আয়াতে তাযকিয়ার কাজটাকে সবশেষে বর্ণনা করা হয়েছে। বাকি তিনটি আয়াতেই তাযকিয়ার ব্যাপারটি দ্বিতীয় নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলতে হয়, এই চারটি আয়াতে উল্লেখিত এই তাযকিয়া

শব্দটিই আত্মশুদ্ধি ও আত্মিক উন্নতি বিধানের কার্যক্রমের ভিত্তি, যা রাসূলের (সা) মৌলিক কাজের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (সা) তাঁর এই মৌলিক দায়িত্ব সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণরূপে পালন করে গেছেন, এটাই তাঁর রেসালাতের প্রতি ঈমানের অনিবার্য ও অপরিহার্য দাবী। ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسْلَتَهُ ط وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

"হে রাসূল ! তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা যথাযথভাবে পৌছিয়ে দাও। যদি এমনটি না কর, তাহলে তোমার প্রতি অর্পিত রেসালাতের দায়িত্ব তুমি পালন করনি বলেই বিবেচনা করা হবে। আল্লাহ তোমাকে মানুষের অনিষ্টকারিতা থেকে হেফাজত করবেন। বিশ্বাস কর, আল্লাহ কাফেরদেরকে (তোমাদের বিরুদ্ধে) সাফল্যের পথ কখনও দেখাবেন না।–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৬৭)

অএতব আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত রেসালাতের অন্যতম মৌলিক কাজ তাযকিয়ায়ে নাফস বা আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উন্নয়নের কাজ রাসূল সরাসরি নিজ হাতে আঞ্জাম দিয়েছেন। (নতুবা তার রেসালাতের দায়িত্ব পালন অসমাপ্ত থেকে যেত, যা কোন ঈমানদার মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।) অতএব আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়ায়ে নাফসের এই মৌলিক কাজটির উপায় ও পদ্ধতি জানতে হলে আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকেই জানতে হবে। কারণ, ইসলামের অন্যান্য মৌলিক ব্যাপারের ন্যায় এ ব্যাপারেও তাঁর গৃহীত এবং শিখানো পদ্ধতিই একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল পদ্ধতি—অন্য কারোটি নয়।

রাসূল (সা)-এর গৃহীত পদ্ধতি অনুযায়ী তাযকিয়ায়ে নাফসের সার্থক প্রচেষ্টা ও সাধনা করেছেন সাহাবায়ে কেরাম (রা)। এরপর তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীন। তাঁরা রাসূলের আদর্শকে সামনে রেখে আত্মশুদ্ধির যে সাধনা করেছেন তাতে যেমন নৈরাশ্যবাদের কোন স্থান ছিল না—তেমনি কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক শিক্ষার সাথে কোন যোগ-বিয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

আত্মশুদ্ধির লক্ষ্য

আমাদের সমাজের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ধারণা হল, যারা আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ। তারা কিছু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হবে। কিছু অতিমানবীয় গুণের ও শক্তির অধিকারী হবে। অসাধ্য সাধনে সক্ষম হবে এবং বৈষয়িক সকল চাওয়া পাওয়ারও উর্ধে হবে। এ কারণে সাধারণ মানুষের কাছে তারা সবসময়ই কিছু একটা রহস্যের আড়ালে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার কৌশল অবলম্বন না করে পারে না।

মূলতঃ এ ধারণা ইসলাম সম্পর্কে চরম অজ্ঞতার ফল। মানুষের মূল পরিচয় মানবতা এবং মানুষের মূল রহস্য ও আশরাফুল মাখলুকাতের প্রকৃত তাৎপর্য তথা আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত দাবী সম্পর্কেও তাদের কোন সঠিক ধারণা নেই। নবী-রাসূলগণ কেন এসেছেন, কি কাজ করেছেন, কোন ধরনের লোক তৈরী করেছেন, বিশেষ করে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল, কি ছিল তাঁর প্রধানতম কাজ এ সম্পর্কেও তাদের সঠিক ধারণা নেই। তাই সত্যিকারের আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জানতে হলে যেমন ইসলাম সম্পর্কে সঠিক, নির্ভুল ও স্বচ্ছ সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা অপরিহার্য, তেমনি মানুষের সঠিক পরিচয় জানাও অত্যাবশ্যক। আম্বিয়ায়ে কেরাম বিশেষ করে শেষ নবীর (সা) কার্যক্রম সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর নির্ভরযোগ্য সূত্র ভিত্তিক নির্ভুল জ্ঞান অর্জনেরও কোন বিকল্প নেই।

কুরআন পরিষ্কার বলেছে, মানুষ এ দুনিয়ায় এসেছে আল্লাহর খলিফা হিসেবে। তার দায়িত্ব আল্লাহর এ জমীনে এবং মানুষের জীবনে আল্লাহর আইন-কানুন, বিধি-বিধান চালু করা। নিজে কেবলমাত্র আল্লাহর গোলামী ও বন্দেগী করা, অন্যান্য মানুষকেও আল্লাহর গোলামী ও বন্দেগী করার সুযোগ করে দেয়া। আল্লাহর গোলামী ও বন্দেগীর পথের সকল বাধা প্রতিবন্ধকতা দূর করাও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা ঃ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق
لَا انْفِصَامَ لَهَا ط

"যারা তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দেয় প্রকৃতপক্ষে তারা একটি মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে যা কখনও ছিন্ন হবার নয়।"—(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬)

বস্তুত মানবজাতিকে এই কাজে সাহায্য করার জন্যেই যুগে যুগে আল্লাহ নবী এবং রাসূল পাঠিয়েছেন। শেষ নবীও দুনিয়ায় এসেছিলেন এই একই উদ্দেশ্যে। বিশেষ করে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এ দুনিয়ায় আসবে, তাদের সকলের জন্যে চূড়ান্তভাবে পথ দেখিয়ে গেছেন। কাজের জীবন্ত নমুনা গোটা বিশ্ববাসীর জন্যে উপস্থাপন করে গেছেন। আল্লাহ তা'আলা গোটা মানবজাতির জন্য তাকেই আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। একমাত্র তাকেই অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে পেশ করেছেন। মানবতা ও মনুষ্যত্বের তথা আধ্যাত্মিকতার জীবন্ত নমুনা—মূর্ত প্রতীকও তাঁকেই বানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পষ্ট ঃ

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ○

"(হে নবী,) অবশ্যই তুমি উন্নত ও সুমহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।"
—(সূরা আল কলম ঃ ৪)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"তোমাদের জন্যে আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই রয়েছে অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য সর্বোত্তম আদর্শ।"—(সূরা আল আহযাব ঃ ২১)

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

"বলো ঃ যদি তোমরা সত্যি সত্যিই আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমাকে (নবী মুহাম্মদকে) অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন।"
—(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১)

মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর সার্থক অনুসারীগণ—যাদের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা—"আল্লাহ তাদের প্রতি রাজী আর তারাও আল্লাহর প্রতি রাজী" কেমন চরিত্রের অধিকারী ছিলেন আল্লাহ নিজে সে সম্পর্কে বলেছেন ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز

"মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদেরও পরিচয় হল—তারা কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে বজ্র কঠিন। পরস্পরের প্রতি রহম দিল, তাদের দেখতে পাবে রুকূ' ও সিজদারত অবস্থায়, আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টির তালাশে সদা নিয়োজিত।"—(সূরা আল ফাতাহ ঃ ২৯)

আল্লাহর রাসূল তাঁর নিজের আগমন সম্পর্কে বলেন ঃ

"আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম আখলাক বা চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্যে।"

এভাবে উন্নত নৈতিকতার যে পূর্ণ বিকাশ আল্লাহর রাসূলের কার্যক্রমের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামগণের জিন্দেগীতে ঘটেছে, তার বর্ণনা খোদ আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে উল্লেখ করেছেন। সূরায়ে আল মু'মিনুনের প্রথম দশটি আয়াতে উল্লেখিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা নিম্নরূপ :

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ
لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ
لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ
هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝

"ঐসব ঈমানদার লোকেরা নিশ্চিতভাবে সফলকাম হবে—যারা নামাযে বিনয়ী, বেহুদা কাজকর্ম থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলে, যাকাতের পন্থায় কর্মতৎপর হয়, যৌনাংগের হেফাজত করে নিজের স্ত্রী এবং ক্রীতদাসী ছাড়া ; কারণ এটা নিন্দনীয় নয়—যারা এর বাইরে কিছু তালাশ করবে তারা অবশ্যই সীমা লংঘনকারী। (সফলকাম বান্দাদের আরও পরিচয়) তারা আমানতের হেফাজতকারী, ওয়াদা পালনকারী এবং নামাযসমূহের হেফাজতে নিয়োজিত। এরাই উহার (জান্নাতুল ফেরদাউসের) অধিকারী হবে।"–(সূরা আল মুমিনুন : ১-১০)

সূরায়ে ফোরকানের শেষ রুকূ'তে রাসূলের হাতে গড়া লোকদের পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে :

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ
قَالُوْا سَلٰمًا ۝ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيٰمًا ۝ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ
رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ اِنَّهَا سَآءَتْ
مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ

ذٰلِكَ قَوَامًا ○ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ
الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ○
يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ○ۖ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ
وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ
غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ○
وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ○ وَالَّذِيْنَ اِذَا
ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ○ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ
رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ○
اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ○ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ۗ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ○

"রহমানের প্রিয় বান্দা তারা, যারা জমীনের উপরে চলাফেরা করে বিনয় ও নম্রভাবে। আর অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে কূটতর্কে জড়াতে চাইলে তারা সালাম বলে তাদেরকে সুকৌশলে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়। যারা তাদের রবের জন্যে রাত অতিবাহিত করে সিজদাবনত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে। যারা এই বলে দোআ করে—হে আমাদের রব ! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাও, যে আযাব আমাদের জন্যে জরিমানা ও অবমাননাকর। বিশ্রাম ও বাসস্থান হিসেবে সেটাতো অতি জঘন্যতম স্থান। যারা অর্থনৈতিক জীবনে ভারসাম্য রক্ষা করে মধ্যপথ অবলম্বন করে। খরচ করতে গিয়ে না বাহুল্য ব্যয় করে, আর না কৃপণতার আশ্রয় নেয়। যারা আল্লাহর সাথে আর কোন মা'বুদকে ডাকে না। আল্লাহর হারাম করা কোন জীবনকে বিনা বিচারে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না। জেনা-ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় না। এমন কাজ যারা করবে তারা নিজেদের কৃতকর্মের পরিণাম —প্রতিফল ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে আযাবের পর আযাব দেয়া হবে এবং চিরস্থায়ীভাবে সেখানে সে আযাব তারা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ ভোগ করতে থাকবে। তবে হ্যা, যারা এসব গুনাহ থেকে তওবা করবে, ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, তাদের খারাপ আমলকে আল্লাহ উত্তম আমল দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আর তিনি তো বড়ই ক্ষমাশীল

ও মেহেরবান। যে তাওবা করে এবং নেক আমল করে সেইতো সত্যিকার অর্থে তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। (রহমানের বান্দাদের আরও পরিচয়) তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। আর কখনও কোন অর্থহীন বেহুদা জিনিস বা কাজের মুখোমুখি হলে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে সেটাকে পাশ কাটিয়ে যায়। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কোন আয়াতের মাধ্যমে নছিহত করা হলে (সে নছিহত আন্তরিকতার সাথে শুনে) অন্ধ ও বোবার মত আচরণ করে না। যারা এই ভাষায় আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করে যে, হে আমাদের রব। আমাদের স্ত্রী-স্বামীদের এবং সন্তানদেরকে আমাদের চক্ষু শীতলকারী বানাও এবং আমাদেরকে খোদাভীরু লোকদের ইমাম বা অগ্রপথিক বানাও। এরাই ঐসব ভাগ্যবান লোক যারা নিজেদের ছবরের ফল ভোগ করবে, উচ্চতম মনযিলে। তাদেরকে সেখানে সম্বর্ধনা জানানো হবে সাদর সম্ভাষণের মাধ্যমে। আর সেখানেই তারা অবস্থান করবে চিরস্থায়ীভাবে। কতই না উত্তম সেই বাসস্থান, কতই না উত্তম সেই বিশ্রামাগার।"–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৩-৭৬)

আল্লাহর রাসূলের হাতেগড়া এই লোকদের ব্যাপারে ইসলামের কট্টর দুশমনদের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

"তারা রাতে দরবেশ আর দিনে অশ্বারোহী বীরযোদ্ধা, কর্মচঞ্চল সৈনিক।"

"তারা কাউকে ধোঁকা দেয় না, তাদেরকেও কেউ ধোঁকা দিতে পারে না।"

আল্লাহর রাসূলের এ সাথীগণ ছিলেন তাঁর সার্থক অনুসারী। আল্লাহর রাসূলকে অনুসরণের ক্ষেত্রে রাসূলের নীতির উপরে, রাসূলের গৃহীত কোন কার্যক্রমের ব্যাপারে কমবেশী করা সাহাবায়ে কেরামগণ না নিজেরা পছন্দ করতেন আর না আল্লাহর রাসূল (সা) তাদেরকে তা করার অনুমতি দিতেন। যেহেতু রাসূল (সা) নিজে অতি মানুষ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেননি, তাই সাহাবায়ে কেরামগণও আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক সাধনা করতে গিয়ে কেউ অতি মানব বনে যাবার প্রয়াস চালাননি। রাসূলের (সা) সহজ-সরল ও স্বাভাবিক জীবনের নমুনা পাই আমরা নিম্নোক্ত হাদীসটিতে ঃ

"হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর স্ত্রীদের কাছে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এল। তারা জানতে চাইল আল্লাহর রাসূলের ইবাদত-বন্দেগী প্রসঙ্গে। অতপর এ বিষয়ে তারা যা কিছু জানল তাতে তাদের মনে হলো এটা তো বেশ কমই বলা চলে। কিন্তু তারা সেই সাথে এও মন্তব্য করল, কোথায় নবী (সা) আর কোথায় আমরা ? তাঁর

তো আগের ও পিছের সকল গোনাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বেই মাফ করে দিয়েছেন। এরপর একজন বলল, আমি নিয়মিত সারা রাত্রি জেগে নামায পড়ব। একজন বলল, আমি প্রত্যেক দিনই নিয়মিত রোযা রাখব। একজন বলল, আমি স্ত্রীলোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকব, এরপর আর কখনও বিয়ে শাদী করব না। ইতিমধ্যে নবী (সা) তাদের কাছে এসে পৌছলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি এসব কথাবার্তা বলাবলি করছিলে ? আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহকে বেশী ভয় করি এবং তার নাফরমানী থেকে সকলের চেয়ে বেশী করে বাঁচার চেষ্টা করি, অথচ আমি কখনও নফল রোযা রাখি আবার কখনও রাখি না। রাত্রি জেগে কখনও নামায পড়ি আবার ঘুমাইও। আমি বিয়ে-শাদী ঘর-সংসারও করে থাকি। যারা আমার সুন্নত তরীকা উপেক্ষা করে তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

উক্ত হাদীসের আলোকে রাসূল (সা)-এর আদর্শ ও সুন্নাতের সত্যিকার ও বাস্তব দিকটি অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে ফুঁটে উঠেছে। রাসূল (সা) নিজে এই বাস্তবসম্মত আদর্শের জীবন্ত নমুনা ছিলেন। এই বাস্তবসম্মত আদর্শই সীরাতে মুস্তাকীম। তাই আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

"হে নবী ! তুমি অবশ্য অবশ্যই সীরাতে মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত আছ।"

এই পথই সর্বসাধারণের পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব। তাই এটাকে মধ্যপথ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল একাই এ পথের অনুসারী ছিলেন না, তিনি তাঁর সাথী-সঙ্গীদেরকেও এ পথের অনুসারী বানিয়েছেন। তাঁর হাতে গড়া উম্মতকে আল্লাহ্ তা'আলা 'খায়রা উম্মাতিন' (উত্তম জাতি) এবং 'উম্মাতে ওয়াসাত' বা মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ মধ্যম পথই উত্তম পথ। তাই রাসূলের হাতে গড়া উম্মত দুনিয়ার জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আদর্শস্থানীয় উম্মত বা জাতি। সকলে যাতে তাদেরকে অনুকরণ ও অনুসরণ করতে পারে এই হিসেবেই তারা মধ্যমপন্থী। আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে গোটা মানবজাতির কল্যাণের জন্যে। মানবজাতিকে সৎপথে পরিচালনা করা, অসৎপথ থেকে বিরত রাখা তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সর্বোপরি তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি।"—(সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط

"এভাবে তোমাদের আমরা মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে গড়ে তুলেছি। যাতে করে তোমরা দুনিয়ার সকল মানুষের উপর সত্যের সাক্ষ্য হতে পার। আর রাসূল তোমাদের উপর সত্যের সাক্ষী হয়ে থাকেন।"

—(সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩)

এখানে সত্যের সাক্ষী অর্থে—সত্য অনুসরণের ক্ষেত্রে মানুষের সামনে নমুনা হওয়ার উপরই অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মধ্যম পথই সকলের পক্ষে অনুসরণ করা বাস্তবসম্মত—তাই সব মানুষের জন্যে অনুসরণ অনুকরণযোগ্য উম্মতকে মধ্যপন্থী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। তারা নিজের মনগড়াভাবে এ পথের অনুসারী নয় বা হবে না। মুহাম্মদ (সা)-এর সার্থক অনুসারী হিসেবেই এমন হতে পারবে। কারণ, তাঁর অনুসৃত পথই ছিল সত্যিকারের মধ্যমপন্থা ও বাস্তবসম্মত পথ। ইসলামে তাযকিয়ায়ে নাফসের বা আত্মশুদ্ধির ও আধ্যাত্মিক সাধনার লক্ষ্য মূলতঃ অনুরূপভাবে বিশ্বের সকল স্তরের সকল মানুষের জন্যে অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য একদল মানুষ সৃষ্টি করা, একদল উম্মত গড়ে তোলা। আল্লাহ তাদেরকে 'খায়রে উম্মত' এবং 'উম্মতে ওয়াসাত' বা মধ্যম ও বাস্তবসম্মত আদর্শের অনুসারী শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে অভিহিত করেছেন।

আত্মশুদ্ধির সঠিক ও নির্ভুল পদ্ধতি

আল কুরআন তাযকিয়ায়ে নাফসের ক্ষেত্রে ঘোষণা করেছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝

"সে-ই সফলকাম, যে তার নাফসের তাযকিয়ার জন্যে চেষ্টা করে। এ জন্যে তার রব বা মুনিবের নাম যিকির করে এবং সালাত আদায় করে।"
–(সূরা আল আ'লা ঃ ১৪-১৫)

এখানে আমরা তাযকিয়ার দু'টি উপায় পাচ্ছি, একটা যিকরুল্লাহ্ আর একটা সালাত। যিকরুল্লাহ যে সালাত থেকে ভিন্ন নয় তারও উল্লেখ পাওয়া যায়। সালাতের লক্ষ্যই হল যিকরুল্লাহ।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ۝

"সালাত কায়েম কর আমার যিকিরের জন্যে।"–(সূরা ত্বাহা ঃ ১৪)

রাসূলে খোদা (সা)-এর গোটা তালীমাত থেকেও দেখা যায়, তিনি তাঁর সাথীদেরকে সহজ-সরল পদ্ধতি এবং সাধারণ ইবাদতের ভিতর দিয়েই গড়ে তুলেছেন। তাঁর এ প্রক্রিয়ায় রাতে ইবাদত বন্দেগী, সালাত ও তিলাওয়াত আর দিনের জেহাদী তৎপরতা এবং সেই তৎপরতার মধ্যে সর্বক্ষণ আল্লাহর কথা স্মরণ রাখা বা যিকির করাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। স্বয়ং আল্লাহর কুরআন এর সাক্ষী। সূরায়ে আল মুমিনুনে, সূরায়ে আল ফুরকানে, সূরায়ে আলে ইমরানের মাঝে মাঝে, সূরায়ে আল মায়েদা, সূরায়ে ফাতহের শেষ রুকূ'তে মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবায়ে কেরাম তথা মু'মিনের যেসব গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে সে সবের প্রতি গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা সহজেই এ সত্য উপলব্ধি করতে পারি যে, ঐসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনই ছিল রাসূলের (সা) তালীমাতের লক্ষ্য। আর সে লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে একান্তই স্বাভাবিক পদ্ধতিতে, সালাত তথা আনুষ্ঠানিক ইবাদত, তিলাওয়াত, মাসনুন তরীকার যিকির ও তাসবীহাত এবং বাস্তব ময়দানের সংগ্রাম-সংঘাতের মাধ্যমে। এর জন্যে আল্লাহর রাসূল আলাদা কোন প্রক্রিয়ার অনুশীলন নিজেও করেননি এবং অন্যদেরকেও করাননি। উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় উপরোক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী লোকেরা দুনিয়ার ইতিহাসে দুশমনের দৃষ্টিতেও 'দিনে বীরযোদ্ধা' এবং রাতে 'দরবেশ' নামে খ্যাত, পরিচিত।

কুরআন সুন্নাহর আলোকে, রাসূলে খোদা (সা)-এর প্রদর্শিত ও অনুসৃত পন্থায় তাযকিয়ায়ে নাফসের জন্যে যে তরীকা অবলম্বন করা উচিত, তা মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

(১) আল ঈমানিয়াত (২) আত্‌তাহারাত (৩) আল ইখবাত (৪) আস্‌সামাহাত এবং (৫) আদালাত।

(১) ঈমানিয়াত ঃ আমাদেরকে সাতটি জিনিসের প্রতি ঈমান আনতে হয় যথা ঃ আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, নবী-রাসূল, আখেরাত, তাকদীর ও পুনরুত্থান প্রভৃতি। এর মধ্যে আল্লাহ, রাসূল এবং আখেরাতই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

খোদা প্রদত্ত এবং রাসূল প্রদর্শিত পথে নাফসের তাযকিয়ার পয়লা কাজ ও পদক্ষেপ হল, যথার্থ অর্থে আল্লাহ, আখেরাত, রাসূল ও কিতাবের প্রতি ঈমান আনা। এখানে ঈমানের সারকথা আল্লাহর রাসূলের (সা) আনীত হেদায়াতের অনুসারী হওয়া, প্রবৃত্তিকে উক্ত হেদয়াতের বশ্যতা স্বীকার করানো। ঈমানের অর্থ আল্লাহর মারেফাত হাসিলও বটে। আল্লাহর জাত, ছিফাত, আল্লাহর হক ও এখতিয়ার সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণকেই মারেফাত বলা হয়। এ পর্যায়ে আল্লাহর কুদরত এরং নেয়ামতের মুশাহাদা এবং এর যথার্থ স্বীকৃতিও অপরিহার্য। কুরআন বলে ঃ

يَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج

"তারা চিন্তা-গবেষণা করে আসমান-জমীনের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে।"
–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১)

এভাবে রাসূলের মর্যাদাকেও জানা ও বুঝা ঈমানের অন্যতম দাবী। সেই সাথে আখেরাতের জীবন, সেখনাকার পরিণাম ও পরিণতি সম্পর্কেও সঠিক ধারণা লাভ করা অপরিহার্য। প্রকৃত প্রস্তাবে ঈমানের অর্থ একজন মানুষের মনে খাওফে খোদা, হোব্বে রাসূল ও ইত্তেবায়ে রাসূল তথা ফিকরে আখেরাতের অবস্থা সৃষ্টি হওয়া বা করা। এটাই ছিল আল্লাহর নবীর প্রথম এবং প্রধানতম কাজ।

(২) তাহারাত ঃ আল কুরআন ঈমানের আহ্বান জানিয়েছে, আল্লাহর দাসত্ব কবুল করতে বলেছে। আর যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে, তাদেরকে আমলের আহ্বান জানিয়েছে। আনুষ্ঠানিক ও মৌলিক কতক ইবাদতেরও নির্দেশ দিয়েছে। আর এই ইবাদতের আগে তাহারাতকে পূর্ব শর্ত বানানো হয়েছে। রাসূলে খোদার তালীমাতে তাহারাত অত্যধিক গুরুত্ব পেয়েছে। বলা হয়েছে, 'আত্তাহুরু শাতরুল ঈমান'—পবিত্রতা ঈমানের অংগ। সুতরাং আল্লাহর নবী আমাদের শারীরিক ও আত্মিক বা মানসিক উভয় দিকের পবিত্রতার ব্যবস্থা করেছেন। শারীরিক ও বাহ্যিক পবিত্রতার জন্য অজু ও গোসলের প্রচলন করেছেন। এটাকে আল্লাহ ও রাসূলের

(সা) পছন্দনীয় কাজ মনে করে সুন্দর ও উত্তম উপায়ে আঞ্জাম দিয়ে আমরা দেহ ও মনের পবিত্রতা অর্জন করতে পারি। নিজের শরীর ও কাপড়-চোপড় পোশাকাদিও পবিত্র রাখার তালীম নবী (সা) দিয়েছেন। এভাবে যারা যতবেশী পবিত্রতা অর্জন করতে পারে তাদের মন-মগজও ততটা পবিত্র হতে সক্ষম। শরীর ও পোশাকের পবিত্রতাসহ জবানের পবিত্রতা এবং নিজের শরীরের রক্ত-মাংসের পবিত্রতার উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জবানের পবিত্রতার জন্যে 'ছিদকে কালাম' বা সদা সত্য কথা বলার অভ্যাস করা এবং মিথ্যা বর্জন করা অপরিহার্য। দেহের রক্ত-মাংসের পবিত্রতার জন্য 'রিজকে হালাল' গ্রহণ করা এবং 'হারাম রিজক' বর্জন করা অপরিহার্য। কেননা হারাম রিজকে গড়া দেহ দোযখের আগুনে পুড়বে। তাছাড়া দুনিয়ার জীবনে ঐ দেহ আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য।

(৩) আল ইখবাদ বা বিনয়াবনত হওয়া ঃ 'আল্লাহ তাঁর সমীপে বিনয়াবনত বান্দাদেরকে ভালবাসেন'।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا ....

"রহমানের প্রিয় বান্দা জমীনে চলাফেরা করে বিনয়ী ও নম্রভাবে।"

এই 'ইখবাত' বা আল্লাহর সমীপে বান্দাকে বিনয়ীরূপে আত্মসমর্পণ করতে শিখায় সালাত, যিকির ও দো'আ। এই স্বভাব নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে হলে তাই যথার্থ ইহতেমামের সাথে ফরয নামায জামাতে আদায়ে অভ্যস্ত হতে হবে। সুন্নাত ও নফলেরও সাধ্যমত ইহতেমাম করতে হবে। রিয়ার (অহংকার) অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্য নফল ইবাদতসমূহের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করা ভিন্ন কথা। কিন্তু এগুলোকে উপেক্ষা করার প্রবণতা দুঃখজনক। ইবাদতে যথার্থ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এগুলোর অবদান কোন বুদ্ধিমান মানুষ অস্বীকার করতে পারে না।

নামায স্বয়ং একটা জীবন্ত যিকির। কিন্তু এরপরও নামাযের বাইরে মাসনুন তরীকার যিকিরের অভ্যাস করতে হবে। এই ক্ষেত্রে তিলাওয়াতে কুরআনকে আফজাল যিকরের মর্যাদা দিয়ে একই সাথে যিকির ও ফিকিরের অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে যেমন খাবার আগে ও পরে, শোবার আগে ও পরে, পায়খানার আগে ও পরে, কোন যানবাহনে ভ্রমণের মুহূর্তে রাসূল পাক (সা) যেসব দো'আ নিজে পড়তেন, সাহাবায়ে কেরামকে পড়তে বলতেন, সেগুলো অর্থসহ আয়ত্ব করা এবং অভ্যাস করার মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে সার্বক্ষণিক ইবাদতে মশগুল রাখতে পারি। এছাড়া বিভিন্ন সময় বা সবসময় রাসূল (সা) যেসব তাসবীহাত পড়তেন। যথা ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

ইত্যাদির অভ্যাস করা যেমন জরুরী তেমনি উপকারীও। নিজেকে আল্লাহর সমীপে বিনয়ী হিসেবে সোপর্দ করার একটা উত্তম মাধ্যম হল দো'আ ও মুনাজাত। নিজের যাবতীয় প্রয়োজনের কথা একমাত্র আল্লাহর কাছেই পেশ করা, ছোট একটা জুতার ফিতার অভাব হলে তাও আল্লাহর কাছেই চাওয়া প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষের মধ্যে উবুদিয়াতের যথার্থ অনুভূতি সৃষ্টি করে থাকে। আল্লাহ্ বলেছেন : "তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দিব।"

اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ لا فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ -

"যখন আমার বান্দা আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন তার উত্তরে আমি বলি, আমি অতি নিকটেই আছি। আমাকে কেউ ডাকলে সাথে সাথে সেই ডাকে সাড়া দেই, অতএব তাদের উচিত আমার ডাকে সাড়া দেয়া। আমার প্রতি ঈমান আনা।"-(সূরা আল বাকারা : ১৮৬)

সেই খোদার কাছে হাত তুলে কিছু চাইতে কারো মনে দ্বিধা, সংকোচ-সংশয় থাকা উচিত নয়। বরং মনের গভীরে একটা সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আল্লাহর দ্বারে ধর্ণা দিয়ে মানুষ কাকুতি-মিনতি করে তার সব প্রয়োজনের কথা বলুক এটাই তো আল্লাহ পছন্দ করেন। দোআর মুহূর্তে নিজেকে আল্লাহর ইচ্ছার উপর পরিপূর্ণ রূপে ছেড়ে দেবার মানসিক প্রস্তুতি নেয়া উচিত। মাইয়েত (লাশ) গোসলদাতার হাতে যেমন অবস্থায় থাকে মুনাজাতে রত থাকা পর্যন্ত নিজেকে আল্লাহর কাছে অনুরূপ অসহায় অবস্থায় পেশ করলেই দোআর মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্যে বেশী পরিমাণে অগ্রসর হওয়া যায়।

(৪) আস্‌সামাহাত : আল্লাহর সমীপে বিনয় অবনত ব্যক্তিকে আরো অগ্রসর হয়ে আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, যেসব বিপদ-মুছিবতের মুকাবিলা করতে হয়, হাসিমুখে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সে সবের মুকাবিলা করতে হবে। এমন অবস্থা, পরিবেশ ও পরিস্থিতির মুকাবিলা করার মত যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এই বিপদ-মুছিবত, পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেমন ঈমানের সাথী, তেমনি এসব পরীক্ষায় সাফল্যজনকভাবে উত্তীর্ণ হওয়াই ঈমানের দাবী। রাসূলে খোদা (সা)-কে যখন জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান কি? উত্তরে বললেন, সবর ও সামাহাত।

সামাহাতের অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহর বান্দাদের জন্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করা। নম্র, ভদ্র ও উদারতাকেও সামাহাত বলা হয়। তবে

সাধারণত সবরের পরিপূরক গুণ হিসেবেই এটা বেশী পরিচিত। হাদীসে যে ধরনের প্রশ্নের জবাবে সবর এবং সামাহাতকে ঈমান বলা হয়েছে, অনুরূপ প্রশ্নের বা প্রশ্ন কর্তার মনোভাবের দিকে চেয়ে আল্লাহর নবী জবাব দিয়েছেন, 'বল আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, অতপর এর উপরে ইস্তেকামাত কর। এই ইস্তেকামাত যেমন সবরের পরিপূরক বরং একটু উন্নতমানের সবরকে ইস্তেকামাও বলা হয়ে থাকে, তেমনি সামাহাতও উন্নতমানের সবরেরই নাম, যার সাথে আর্থিক কুরবানীর যোগসূত্র আছে, যোগ আছে মনের উদারতা এবং প্রশস্ততার।

রোযা, যাকাত ও হজ্জের মাধ্যমে একজন ঈমানদার ব্যক্তির মধ্যে এই গুণের পূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে। সত্যি বলতে কি এই তিনটি মৌলিক ইবাদত থেকে এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অবশ্যই অর্জন করতে হবে। রোযা মু'মিনের মধ্যে তাকওয়া ভিত্তিক চরিত্রের বিকাশ ঘটায়। সবর ও আত্মসংযমের যোগ্যতা বাড়ায়। সেই সাথে আল্লাহর বান্দাদের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশে সাহায্য করে। এই মুহূর্তে আল্লাহর বান্দাদের জন্যে অকাতরে খরচ করবারও প্রেরণা লাভ করে থাকে। সুতরাং আল্লাহর পথের পথিককে মাহে রমযানের ফরয রোযা ইহতেমামের সাথে রাখার সাথে সাথে মাঝে মধ্যে নফল রোযা রাখার অভ্যাসও গড়ে তুলতে হবে।

নিছক আল্লাহর সন্তোষলাভের আশায় আল্লাহর দেয়া রিজিক থেকে গরীবদের জন্যে আল্লাহর নির্ধারিত অধিকার তাদেরকে পৌছে দেবার একটা বিজ্ঞানসম্মত উপায় হল যাকাত। যাকাতদাতা যাকাতের অর্থ প্রদান করে বিনিময়ে কোন প্রতিদান আশা করলে যাকাত আদায় হয় না। সুতরাং যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে গিয়ে এমন মন-মানসিকতা যাতে জন্ম না নিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই ইসলামী শরীয়তে যাকাতের অর্থ বায়তুলমালে জমা দেবার নিয়ম ও ব্যবস্থা রয়েছে। এই যাকাতের ব্যবস্থা ছাড়াও আল্লাহ বান্দাদেরকে তাদের নিকটাত্মীয়-স্বজন তথা দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্যে খরচ করতে হয়, সেই খরচ হতে হবে নিছক আল্লাহর সন্তোষ ও মুহাব্বত লাভের উদ্দেশ্যে। শরীয়তসম্মত উপায়ে যাকাতের অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে নেক্‌কার, ঈমানদার বান্দারা এভাবে নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের প্রেরণা পেয়ে থাকে, অকাতরে আর্থিক কুরবানী পেশ করতেও সক্ষম হয়।

এভাবে হজ্জের মাধ্যমে সফরের অবর্ণনীয় কষ্ট ও দুর্ভোগ সহ্য করে, সফরের ব্যয়ভার বহন করেও আল্লাহর বান্দারা উপরে বর্ণিত গুণের অধিকারী হতে পারে। সুতরাং যাদের উপর হজ্জ ফরয তারা অবশ্য এ ফরয আদায়ের

মাধ্যমে এই অপরিহার্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। যাদের পক্ষে সম্ভব ফরয হজ্জের পর ওমরাহ বা একাধিকবার হজ্জ ব্রত পালনের মাধ্যমে আল্লাহর আয়াতসমূহের মুশাহাদার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের এই সুযোগকে কাজে লাগাবে এবং এ থেকে নিজের চরিত্রে বাঞ্ছিত মানের সবর ও ইস্তেকামাতের (সবর ও সামাহাতের) বিকাশ ঘটাতে প্রয়াস পাবে।

(৫) আদালাত ঃ উপরে বর্ণিত চারটি কাজ অর্থাৎ ঈমানিয়াত, তাহারাত, ইখবাত ও সামাহাতের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজের মধ্যে আল্লাহর পছন্দনীয় গুণাবলী সৃষ্টি করতে প্রয়াস পেতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দার কাছে কেবলমাত্র ব্যক্তি কেন্দ্রিক গুণাবলীর বিকাশই দেখতে চান না। বরং তিনি চান এই পছন্দনীয় গুণাবলীর অধিকারী বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী লোকেরা আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীনকে পরিপূর্ণরূপে বিজয়ী করে মানুষের সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করুক। আল্লাহ স্বয়ং সরাসরি গোটা সৃষ্টিলোকে তাঁর বিধানকে কার্যকর করেছেন, ফলে সৃষ্টিলোকের শান্তি ও শৃংখলা বিরাজমান। মানুষের সমাজেও তাঁর বিধান কার্যকর হয়ে শান্তি-কল্যাণ ও ন্যায়-ইনসাফ কায়েম হোক এটাই আল্লাহর ইচ্ছা। কিন্তু আল্লাহ এখানে তাঁর ইচ্ছার বাস্তবায়ন চান মানুষের মাধ্যমে। এই জন্যই মানুষ আল্লাহর জমীনে তাঁর খলিফা।

সুতরাং মানুষের জীবনে ও আল্লাহর জমীনে আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জি মাফিক ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ কায়েম করার জন্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা-সাধনা বা সংগ্রাম করাই হতে হবে ঈমানদার লোকদের—আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের লক্ষ্য। আর এ কাজের বিনিময়ে আখেরাতে মুক্তি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি হতে হবে তাদের জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য। উপরে বর্ণিত চারটি প্রক্রিয়া বা কার্যক্রম পরিচালিত হতে হবে এই শেষোক্ত কাজটাকে তথা আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত নেজামে আদালত বা ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ কায়েমকে কেন্দ্র করেই। এই কাজটি ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে আঞ্জাম দিলেও চলবে না ; এ জন্যে উপরের চারটি কাজ সহ এই সর্বশেষ কাজটি বাস্তবায়ন হতে হবে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে। এভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে যারা আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টায় প্রাণান্তকর সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ তাদেরকেই ভালবাসেন। প্রিয় বান্দাহ হিসেবে কবুল করেন।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ○

"আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা লড়াই করে আল্লাহর পথে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐকবদ্ধ হয়ে।"—(সূরা আস্ সফ ঃ ৪)

যেহেতু আল্লাহর দ্বীনের ভিত্তিতে সমাজে শান্তি, শৃংখলা ও ন্যায়-ইনসাফ কায়েম হওয়া আল্লাহর নিজেরই ইচ্ছা, সুতরাং যারা একাজে হাত দেয় তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর মর্জির সাথেই একাত্মতা ঘোষণা করে থাকে। অতএব, তাদেরকে সাহায্য করা আল্লাহর নিজের দায়িত্ব হয়ে যায়। এই কাজটাকে আল কুরআন 'জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ' নামে অভিহিত করেছে। একাজে আল্লাহ চেয়েছেন মালের কুরবানী এবং জানের কুরবানী। আর এর বিনিময়ে আল্লাহ তাদের যে পুরস্কার দেবেন তা দু' ধরনের। সর্বোত্তম পুরস্কারটা হল দোযখের কঠিন ভয়াবহ শাস্তি থেকে নাজাত, আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সদাবসন্ত বিরাজমান বেহেশত। আর অপরটি আল্লাহর ভাষায় মানুষের কাছে যেটা আকর্ষণীয় তা হবে আল্লাহর সাহায্যে জাগতিক বিজয়। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদাকৃত উভয় প্রকার পুরস্কার পাওয়ার জন্যই ঈমানের ঘোষণায়, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ঘোষণায়, আল্লাহর জন্যে জান-মালের কুরবানীর ঘোষণায় কে কতটা সত্যবাদী, তার যাচাই-বাছাই এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তাই একাজে আল্লাহর সাহায্য অবধারিত এবং আল্লাহর সাহায্যে বিজয়ও অবশ্যম্ভাবী। এতদসত্ত্বেও সাথে সাথে বিজয় আসে না। বরং এ পথের যাত্রা শুরু হলেই কায়েমী স্বার্থের পক্ষ থেকে বাধা প্রতিবন্ধকতা আসতে থাকে। ঈমানদার লোকদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে কায়েমী স্বার্থের পক্ষ থেকে বাধা- বিপত্তির মাত্রাও বাড়তে থাকে। আর এ বাধা আসবেই, আসতে বাধ্য। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ

"আমি অবশ্য অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা নিয়ে ছাড়ব। যাতে করে আমি জেনে নিব, কারা আল্লাহর পথে সংগ্রামী আর কারা ধৈর্য ধারণকারী।"
–(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩১)

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ○ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ○

"মানুষ কি মনে করেছে যে, কেবল ঈমানের ঘোষণা দিয়েছে বলেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে ? তাদের পরীক্ষা নেয়া হবে না ? অথচ তাদের পূর্বের লোকদের পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। এভাবে আল্লাহ জানতে চান। ঈমানের দাবীতে কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী।"
—(সূরা আনকাবুত ঃ ২-৩)

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ

مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ۗ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ○

"তোমরা কি মনে করেছ এমনিতেই বেহেশতে পৌঁছে যাবে, এখনও তোমাদের সামনে সেই অবস্থা আসেনি—যে অবস্থা এসেছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি ; তাদেরকে তো কষ্টের পর কষ্টের এবং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমনকি স্বয়ং রাসূল ও তার ঈমানদার সাথীগণ (চীৎকার করে) বলে উঠেছেন—আল্লাহর সাহায্য কতদূর ? জেনে রাখ, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।"—(সূরা আল বাকারা ঃ ২১৪)

এভাবে আল্লাহর কুরআনের অগণিত আয়াতে সুস্পষ্ট ঘোষণা এসেছে, পরকালীন সাফল্যের জন্যও তিনি আমাদের পরীক্ষা নিবেন এবং ইহকালীন সাফল্যের জন্যও নিবেন। স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা পরীক্ষা স্বরূপ আসা বাধাবিপত্তি বা সাময়িক বিপর্যয়ে ধৈর্যহারা হয়ে যায়, মনের আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং এ কাজের যথার্থতা ও যৌক্তিকতা এবং অপরিহার্যতা সম্পর্কে নানা সন্দেহ ও সংশয়ের শিকার হয়। তাই কুরআন এসব সাময়িক বিপর্যয়ের নিগূঢ় রহস্য সম্পর্কে আরো সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে।

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ۗ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ○ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ○ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ○

"তোমরা যাদিওবা কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছো, অনুরূপ ক্ষতির সম্মুখীন তো আরও অনেকে হয়েছে। এভাবে দিনসমূহকে (সুদিন অথবা দুর্দিন) আমি মানুষের মাঝে আবর্তিত করে থাকি। এভাবে আল্লাহ তা'আলা জেনে নিতে চান কারা সত্যিকারের ঈমানদার, আর কবুল করতে চান কিছু লোকদের শহীদ হিসেবে। আল্লাহ জালেমদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ তা'আলা খাঁটি ঈমানদারদের ছাঁটাই বাছাই করতে চান এবং মূলোৎপাটন করতে চান কাফেরদের। তোমরা কি মনে কর, আল্লাহর পথে কারা সত্যিকারের সংগ্রামী এবং ধৈর্যশীল তা যাচাই না হতেই তোমরা বেহেশতে পৌঁছে যাবে ?"—(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪০-১৪২)

আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা মতে, তাঁর নির্ধারিত সুন্নাত মতে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার, বাধা-প্রতিবন্ধকতা ও বিপর্যয়ের স্তর পেরিয়ে এসেই তাঁর প্রিয় বান্দারা দুনিয়ার শান্তি এবং আখেরাতের মুক্তির নিশ্চয়তা বিধানকারী এক সমাজ কায়েম করতে সক্ষম হয়।

আল্লাহর কোন একদল বান্দার এ প্রাণান্তকর সংগ্রাম-সাধনা সত্ত্বেও সাফল্য নাও আসতে পারে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর বান্দারা যদি নিজেরা ঈমান ও ইস্তেকামাতের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়, তাহলে তাদের আখেরাতের সাফল্য অবশ্যই তারা পাবে। সুতরাং এ পথের কোন একটি পদক্ষেপ বৃথা যাবার নয়। এ পথের যাত্রীদের কাছে ব্যর্থতা বলে কোন জিনিসের পরিচয় জানা নেই। এ পথে আছে কেবল সফলতাই সফলতা। ঈমানদারদের পরিচয় এবং কাজ সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ قف

"আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার লোকদের জান এবং মাল বেহেশতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা কেবল আল্লাহর পথে লড়াই করে মরবে এবং মারবে।"—(সূরা আত তাওবা ঃ ১১১)

অর্থাৎ ঈমানের ঘোষণার অনিবার্য দাবীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো —জান-মাল আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা এবং এটাকে কেবলমাত্র আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ের সংগ্রামে ব্যবহার করা। এর নামই বাইয়াত। বাইয়াতের মূল কথা, যেখানে আল্লাহর দ্বীন কায়েম নেই সেখানে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে নিয়োজিত জামায়াতের মাধ্যমে ঈমানদার লোকেরা তাদের জান ও মালকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করবে। আর যেখানে দ্বীন কায়েম আছে সেখানে এ দ্বীনকে টিকিয়ে রাখার জন্য সব বৈধ কাজের আনুগত্যের ওয়াদা এবং আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-নিষেধ মেনে চলার ওয়াদাকেই বাইয়াত বলা যেতে পারে।

এই বাইয়াত ইসলামী শরীয়তে ফরয। এবং অনুরূপ বাইয়াত ব্যতীত মৃত্যু বরণকে হাদীসে রাসূলে জাহেলিয়াতের মৃত্যু নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাসাউফ পন্থীদের মধ্যে বর্তমানে যে বাইয়াত প্রথা প্রচলিত দেখা যায়, তার সূচনা হয়েছিল এমনি একটি সংগ্রামী জযবা এবং চেতনা নিয়েই। ইতিহাসের নির্মম পরিহাস—বর্তমানে যারা বাইয়াত নেন (পীর সাহেবগণ) তারাও এর গূঢ় রহস্য সম্পর্কে উদাসীন। আর যারা বাইয়াত গ্রহণ করেন (মুরিদগণ) তাদের তো ব্যাপারটা সম্পর্কে কোন কিছুই জানার সুযোগই হয়নি।

বাইয়াতের আসল রূপ হলো ঃ "আমার জান ও মালের আসল মালিক আল্লাহ—'কালেমা লা-ইলাহা'র ঘোষণার সাথে সাথে আমি এ সত্যেরই স্বীকৃতি দেই, অতএব এখন থেকে এই জান, এই মাল আমার ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারব না। এ দু'টোকে ব্যবহার করতে হবে আল্লাহর মর্জি মত।" আল্লাহর মর্জি মত এ জান ও মালকে ব্যবহার করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরাম প্রথমত নবী (সা)-এর কাছে নিজেদের জান-মাল সোপর্দ করতেন, নবী (সা) তাদের সম্মিলিত জনশক্তিকে এবং আর্থিক শক্তিকে আল্লাহর দেখানো পথে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের যামানায়ও সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের প্রতিনিধি হিসেবে খলিফাদের কাছে নিজেদের পেশ করেন, আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক খলিফাগণ রাষ্ট্র পরিচালনার ওয়াদা করেছেন আর সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে সহযোগিতা করার, তাদের আনুগত্য করার ওয়াদা করেছিলেন।

বর্তমানে আমাদের দেশে ইসলামী খেলাফত বা হুকুমাত কায়েম নেই। সুতরাং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাসূলের প্রতিনিধি স্থানীয় কারো পক্ষ থেকে যেমন আল্লাহ ও রাসূলের বিধান মতে আমাদের পরিচালনা করার কোন ওয়াদা করা হচ্ছে না, তেমনি আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহর বাস্তবায়নে আমাদের সহযোগিতা বা আনুগত্যের কোন দাবী করারও কেউ নেই। এমতাবস্থায় জাহেলিয়াতের মৃত্যু থেকে বাঁচার উপায় হলো, আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল প্রদর্শিত আদর্শের ভিত্তিতে আল্লাহর বান্দাদের পরিচালনা করার পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ এক মনা ও এক চিন্তার লোকদের সংঘবদ্ধ বা জামায়াতবদ্ধ হওয়া ; উক্ত জামায়াতের মাধ্যমে জানের কুরবানী ও মালের কুরবানী পেশ করে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে প্রাণান্তকর সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা। এ ক্ষেত্রে অনুরূপ জামায়াতভুক্ত লোকদের কাছে জামায়াতের নেতৃত্ব হবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের বিকল্প।

পরিপূর্ণ ইসলামী বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত একটি দেশে অনুরূপ ইসলামী দল পদ্ধতিগত মতপার্থক্যের কারণে একাধিকও থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি যেটাকে অধিকতর তরীকায়ে মুহাম্মদীর অনুসারী মনে করবে সে সেটাতেই যোগদান করতে পারবে।

মো'জিযা ও কারামত

তাযকিয়ার লক্ষ্য প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমরা উল্লেখ করেছি, আজকাল এক শ্রেণীর মানুষ আধ্যাত্মিকতা ও আত্মশুদ্ধির সাধনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেবলমাত্র কারামতি ও তেলেসমাতি জাতীয় কর্মকান্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। আমাদের এই মন্তব্যের কারণে কেউ যেন একথা না বোঝেন যে, আমরা আদৌ মো'জিযা এবং কারামতকে স্বীকার করি না।

নবী-রাসূলগণের (আ) মো'জিযা ও অলি-আল্লাহদের কারামতি হক। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এই সর্বস্বীকৃত ধারণা-বিশ্বাসের প্রতি আমরাও বিশ্বাস পোষণ করি। মো'জিযা ও কারামত প্রসঙ্গে আকায়েদের কিতাবসমূহে যেমন উল্লেখ হয়েছে যে, নবীদের মো'জিযা এবং অলি-আল্লাহদের কারামত হক, সেখানে একথাও উল্লেখ আছে যে, এটা হয় সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ইচ্ছায় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে। এতে নবী-রাসূলদেরও নিজস্ব কোন এখতিয়ার থাকে না। অলি-আল্লাহদের ব্যাপারে তো প্রশ্নই উঠে না।

মো'জিযা ও কারামত দু'টোই মূলতঃ অস্বাভাবিক, অতি প্রাকৃতিকভাবে কিছু বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে যাওয়া। যা বস্তুবাদী দৃষ্টিতে বা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে ঘটার কথা নয়। এমন ঘটনা, যা নবী-রাসূলদের (আ) জীবনে ঘটেছে সেগুলো মো'জিযা বা বাইয়্যেনা নামে অভিহিত। মূলতঃ এগুলো ঘটেছে একান্তভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইছবাতে নবুয়াত ও ইতমামে হুজ্জত হিসেবে।

ইছবাতে নবুয়াত অর্থাৎ নবুয়াতের প্রমাণ স্বরূপ। ইতমামে হুজ্জত অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণের দাওয়াত অস্বীকার করার ফলে আযাব দেবার আগে মানুষের ওজর পেশ করার সকল রাস্তা বন্ধ করার জন্যে। এছাড়া বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী-রাসূলগণকে অলৌকিকভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রতিপক্ষের কলা-কৌশল ও ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দিয়েছেন এমনভাবে যা মানবীয় দৃষ্টিতে বা বস্তুবাদী ধারণায় আদৌ কল্পনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা একথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, এই ব্যাপারে নবী-রাসূলদের কারো কোন ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা এখতিয়ারের কোন স্থান ছিল না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ع

"(হে নবী,) তুমি তো তাদের প্রতি নিক্ষেপ করনি। প্রকৃতপক্ষে নিক্ষেপ করেছেন আল্লাহ স্বয়ং।"—(সূরা আল আনফাল ঃ ১৭)

নবী-রাসূল ছাড়াও ঈমানদার এমনকি সাধারণ ঈমানদারদের জিন্দেগীতেও অলৌকিক অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে পারে। আল্লাহ তা'আলার নিজের ঘোষণা মতে তিনি সকল ঈমানদার বান্দাদেরই অলি।

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ

"যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অলি-অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে ধাবিত করেন।"—(সূরা বাকারা ঃ ২৫৭)

আকায়েদের কিতাবে নবীদের মো'জিযার পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

"অলি-আল্লাহদের কারামত হক। সেই সাথে একথাও সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এতে ব্যক্তির কোন ইচ্ছা বা এখতিয়ারের দখল নেই। এটা হয়ে থাকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে। ইলমে তাসাউফের ময়দানে যারা বেশী অগ্রসর তারাও এ ব্যাপারে একমত যে, কারামত কামালিয়াতের দলিলও নয়, শর্তও নয়। একজন অনেক বেশী বুযূর্গ ও কামেল ব্যক্তির জীবনে কারামত নামে অভিহিত হবার মত কোন ঘটনা আদৌ নাও ঘটতে পারে। আবার একজন সাধারণ ঈমানদারের যিন্দেগীতে বড় রকমের কোন ঘটনাও ঘটতে পারে।"

আকায়েদের কিতাবসমূহে কারামতের পাশাপাশি 'ইস্তেদরাজ'-এর আলোচনাও করা হয়েছে। ইস্তেদরাজ বলা হয় কোন মানুষের পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অতিপ্রাকৃতিক কিছু ঘটনা ঘটাবার প্রয়াস চালানোকে। যারা এরূপ করে তাদের অলি-আল্লাহ বলা তো দূরের কথা বরং তাদেরকে ফাসেক ও জিন্দিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা শরীয়তের সীমার মধ্যে তাসাউফ চর্চা করেন অন্য কথায় আল কুরআনের আলোকে তাযকিয়ায়ে নাফসের সাধনা করেন, হাদীসের আলোকে ইহসানের চরিত্র অর্জনের প্রচেষ্টা চালান, তারা কারামতির চর্চাকে কখনও প্রাধান্য দেন না, দিতে পারেন না। বরং তাদের দৃষ্টিতে তাদের সাধনার মূল সাফল্য আল্লাহর হুকুম-আহকাম মেনে চলার যোগ্যতা ও শক্তি অর্জনে সক্ষম হওয়া। এবং আল্লাহর যাবতীয় নাফরমানী থেকে নিজেকে বাঁচাবার তৌফিক অর্জিত হওয়া।

নিকট অতীতে বাংলা ও আসামের একজন প্রভাবশালী পীর শাহ সুফী হযরত আবু বকর (র)-এর জীবনী পাঠে জানা যায় তাঁর দরবারে একজন লোক প্রায় ছয় মাস অবস্থানের পর তাঁকে কিছু না বলেই যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন হযরত পীর সাহেব (র) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা এতদিন থাকলে কিন্তু কেন আসলে কিছু যে জিজ্ঞেস করলে না ? তখন লোকটি উত্তরে

বলেছিল, হুজুর বড় আশা নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছি। তখন হযরত পীর সাহেব (র) আরো জানতে চাইলেন, বাবা কি আশা নিয়ে এসেছিলে, আর হতাশই বা কেন হলে ? তখন লোকটি বলল, শুনেছিলাম আপনি বাংলা ও আসামের নামকরা পীর। কিন্তু ছয় মাস এখানে কাটালাম আমার চোখে কোন কারামতিই দেখার সুযোগ হল না, তাই হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছি। তখন পীর সাহেব (র) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা তুমি যতদিন এখানে ছিলে আমাকে কোন ফরয কাজ তরক করতে দেখেছ ? বেচারা উত্তর দিল, না। কোন ওয়াজেব তরক করতে দেখেছ ? লোকটি বলল, না। এভাবে পীর সাহেব তাকে সুন্নাত-মুস্তাহাব আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে একই উত্তর পেলেন। তারপর আবার প্রশ্ন করলেন, এ ছয় মাসে আমাকে কোন হারাম কাজ করতে দেখেছ ? লোকটি উত্তরে বলল, না। কোন মাকরূহ কাজ করতে দেখেছ ? লোকটি উত্তরে বলল, না। এরপর পীর সাহেব মরহুম তাকে বললেন ঃ বাবা একজন মু'মিনের জিন্দেগীতে এটাই বড় কারামতি।

কারামত তথা আধ্যাত্মিক সাধনার সাফল্যের প্রসঙ্গে অতীতের সকল সূফী সাধকগণই অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। আজকের দিনে তাদের অনুসারী উত্তরসুরী হিসেবে যারা পরিচিত আল্লাহ তাদেরকেও এ ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করার তৌফিক দিন। আমিন।

আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়

আসমান-জমীনের স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষকে এই দুনিয়ায় তার খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। এই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের কারণে মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির সেরা—তার পরিচয় সে আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহ রব বা মুনিব আর মানুষ তার খলিফা এবং আবদ বা দাস। মানুষ এ দুনিয়ায় আসবার মুহূর্তে আল্লাহকে রব বা মুনিব মেনে চলার মাধ্যমে তাঁর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করার অঙ্গীকার করেই এসেছে। কিন্তু মানুষের চিরশত্রু ইবলিস মানুষের এই মর্যাদা, এই সম্মান বরদাশত করতে পারেনি। সে কেয়ামত পর্যন্ত মানবগোষ্ঠীকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের এই দায়িত্ব পালনের পথে বাধা, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির শপথ নিয়েছে। মানুষের জীবন পথের বাঁকে বাঁকে, চলার পথের মোড়ে মোড়ে নানা বিভ্রান্তির বেড়াজাল সৃষ্টি করে আসছে আবহমানকাল থেকেই। ফলে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক সৃষ্টি হবার কথা, অন্য কথায় মানুষের পক্ষ থেকে আল্লাহর সাথে যে সম্পর্ক বজায় রেখে চলার কথা ছিল—মানুষের পক্ষে মাঝে মাঝে সে সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে মাটির এ পৃথিবীতে যে সুকঠিন এক দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, সে দায়িত্ব পালনের পথে যে ইবলিস বাধা সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ করে এসেছে এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা গাফেল নন। মানুষকে অভিশপ্ত ইবলিসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করবার জন্যে নিজেই অভয় বাণী শুনিয়েছেন ঃ

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

"অতপর আমার পক্ষ থেকে হেদায়াত আসবে, যারা সেই হেদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই।"

—(সূরা আল বাকারা ঃ ৩৮)

এভাবে মানুষ আল্লাহর সাথে যে সম্পর্ক বজায় রাখার অঙ্গীকার সহ এ দুনিয়ায় এসেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সে অঙ্গীকারের কথা যেমন স্মরণ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি উক্ত দায়িত্ব পালনের উপায়ও বাতলিয়ে দিয়েছেন যুগে যুগে অহির জ্ঞান নাযিল করে এবং সে দায়িত্ব পালনের বাস্তব শিক্ষাও দান করেছেন নবী-রাসূলদের মাধ্যমে। সুতরাং আল্লাহর সাথে বান্দার

সঠিক সম্পর্কের সংজ্ঞা নির্ণয় করা, উক্ত সম্পর্ক স্থাপন ও বৃদ্ধি করার বিষয়টি কোন অভিনব বা দুর্বোধ্য ব্যাপার নয়। ব্যাপারটাকে দুর্বোধ্য বানানো হয়েছে মনগড়া উপায় অবলম্বন করেই। অথচ এ ক্ষেত্রে মনগড়া কোন উপায় বা পথের অনুসরণের আদৌ কোন অবকাশ নেই। একমাত্র নবী-রাসূলদের বিশেষ করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রদর্শিত পথেই আল্লাহর সাথে বান্দার সঠিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে এবং তার দেখানো পথে চেষ্টা-সাধনায় নিয়োজিত থেকেই এ সম্পর্ক বৃদ্ধিও করা যেতে পারে।

মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ হেদায়াত বা সর্বশেষ কেতাব আল কুরআন আমরা পেয়েছি তাঁর সর্বশেষ রসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে। উক্ত কেতাবের আলোকে এবং শেষ নবী (সা)-এর পদাংক অনুসরণ করেই আমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শিক্ষার আলোকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির ব্যাপারে তিনটি জিনিস আয়ত্ব করা অপরিহার্য। (এক) আল্লাহ তা'আলার সঠিক মারেফাত বা পরিচয়। (দুই) সঠিক অর্থে আল্লাহ তা'আলার উবুদিয়াত বা দাসত্ব করা (তিন) আল্লাহর মনোনীত পথে চলা এবং অমনোনীত পথ বর্জন করা। আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে উক্ত তিনটি বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব।

আল্লাহর মারেফাত

আল্লাহর সাথে আমার সম্পর্ক কেমন হবে তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তার মারেফাত বা পরিচয়ের উপর। দুনিয়াতে যত বিপর্যয়, যত বিশৃংখলা, যত অশান্তি তার মূলে রয়েছে আল্লাহর সঠিক পরিচয়ের বিস্মৃতি। অন্যথায় মানুষ কোন দিনই আল্লাহকে একেবারে অস্বীকার করেনি। কট্টর নাস্তিক বলে যারা পরিচিত তারাও প্রত্যক্ষ না হলেও অন্ততঃ পরোক্ষভাবে আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিয়ে আসছে মানব ইতিহাসের প্রায় সব অধ্যায়েই। তাই আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়ে মানুষের সামনে তাঁর সঠিক মারেফাত বা পরিচয়ই তুলে ধরেছেন। নিছক তার অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্যে বা মানাবার জন্যে কোন নবী-রাসূল আসছেন ইতিহাসে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) যাদের মাঝে আবির্ভূত হয়েছিলেন তারা আল্লাহর অস্তিত্ব মানত। কিন্তু আল্লাহর সঠিক মর্যাদা সম্পর্কে, সঠিক পরিচয় সম্পর্কে তারা ছিল অজ্ঞ। তারা দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করত। তাও এই বিশ্বাস নিয়ে যে, এগুলো তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করবে। তারা তো ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সন্তান নামে আখ্যায়িত করত।

অনুরূপভাবে আহলে কিতাব অর্থাৎ তৌরাত ও ইঞ্জিলের অনুসারী ব্যক্তিরাও আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিল না। হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর সঠিক পরিচয়ও লাভ করেছিল। কিন্তু প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে গিয়ে ইবলিসের কাঁধে পা দিয়ে ঈসায়ী ও ইহুদী পন্ডিতগণ আল্লাহর কিতাবে মনগড়া পরিবর্তন আনে। ফলে তৌরাত ও ইঞ্জিলের পরবর্তী অনুসারীগণ আল্লাহর সঠিক মারেফাত লাভে ব্যর্থ হয়, সেই সাথে তারা ব্যর্থ হয় আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভেও। মহানবী (সা) তৎকালীন আরবে এদেরকেই আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন। এ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় মহানবী (সা) তাদেরকে নিছক আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত পরিচয় তাদের সামনে তুলে ধরে, যথার্থ অর্থে তার প্রতি ঈমান আনার, অন্য কথায় তাঁর দাসত্ব, গোলামী ও বন্দেগী কবুল করার আহ্বান জানিয়েছেন। সুতরাং আমরা যারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের প্রত্যাশী, তাদেরকেও তাই সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার সঠিক মারেফাত, সঠিক পরিচয় লাভ করতে হবে।

এ মারেফাত বা পরিচয় লাভের উপায়

আল্লাহ তা'আলার মারেফাত হাসিল করতে হলে পাঁচটি বিষয়ে সঠিক ধারণা লাভ করা একান্তই অপরিহার্য। (১) আল্লাহ তা'আলার জাত সম্পর্কে

সঠিক ধারণা (২) আল্লাহ তা'আলার ছেফাত বা গুণাবলী সম্পর্কে সঠিক ধারণা (৩) আল্লাহ তা'আলার আপয়ালে কুদরত বা কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক ধারণা (৪) আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত সম্পর্কে ধারণা (৫) আইয়ামুল্লাহ বা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অতীতে নাফরমান লোকদেরকে যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হয়েছে সে সব ঐতিহাসিক দিনসমূহের আলোচনা এবং সর্বশেষ দিন ইয়াওমুদ্দিন সম্পর্কীয় ধারণা।

আল্লাহর জাত

মহানবী (সা) আল্লাহর মারেফাত হাসেলের জন্যে আল্লাহর 'জাত' সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, মানুষের বিবেক-বুদ্ধি তাঁর 'জাত' সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে কোন কিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরিচয় জানবার জন্যে আমাদেরকে সৃষ্টিলোকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর 'জাত' সম্পর্কে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা) আমাদেরকে যে পরিচয় দান করেছেন সেটাই আল্লাহর 'জাত' সম্পর্কে সঠিক ধারণা। মহানবী (সা) যখন ঈমানের দাওয়াত পেশ করেন তখনকার সমসাময়িক বিশ্বে মুশরিকগণ আল্লাহর জাতের সাথে অগণিত দেব-দেবীকে শরীক মনে করত, তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যাসন্তান নামে অভিহিত করত। ইহুদীগণ হযরত ওজায়ের (আ)-কে আল্লাহর পুত্রসন্তান মনে করে আল্লাহর জাতের সাথে তাঁর শরীকানা সাব্যস্ত করত। ঈসায়ীগণ হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র নামে অভিহিত করে তাকেও আল্লাহর জাতের অংশীদার মনে করত। তারা ভাল কাজের এবং মন্দ কাজের পৃথক পৃথক স্রষ্টা সাব্যস্ত করে পৃথক পৃথক নামেই অভিহিত করত। ভাল কাজের স্রষ্টাকে তারা বলত ইয়াজদান এবং মন্দ কাজের স্রষ্টাকে তারা বলত আহরামান। আল্লাহর জাত সংক্রান্ত এই সমুদয় বিকৃত ধারণা অপনোদন করে কুরআন সূরা আল ইখলাসে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিল ঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ○

"হে নবী ! আপনি ঘোষণা করুন ঃ আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়, তিনি সৃষ্টি জগতের কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কোন সন্তান-সন্তুতির জনক নন, তিনিও কারো ঔরষজাত নন। তাঁর সমকক্ষ কেউই হতে পারে না।"

বস্তুত আল্লাহর জাত সম্পর্কে এটাই হল সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণনা। মানুষের ভাষায় এর কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। বাকী চারটি বিষয় নিয়ে আমরা যতখুশী

চিন্তা-গবেষণা চালাতে পারি। আর এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা চালানোর প্রতি আল্লাহ তা'আলা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আল্লাহর কুরআন বলে ঃ

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِاُولِي الْاَلْبَابِ ۝

"আসমান জমীনের সৃষ্টির মধ্যে দিবা-রাত্রির পরিবর্তন ও আবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্যে (আল্লাহর সার্বভৌমত্বের) নিদর্শনাবলী বিদ্যমান।"
–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০)

আল্লাহর ছিফাত

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের মাধ্যমে নিজের পরিচয় উপস্থাপন করেছেন। উক্ত উপস্থাপনায় যেমন তাঁর বিভিন্ন কুদরত ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তির বর্ণনা আসছে তেমনি তাঁর কতক গুণবাচক নামও উল্লেখিত হয়েছে। উক্ত গুণবাচক নামগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে আমরা আল্লাহ তা'আলার মারেফাত হাসেল করতে পারি। আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর অসংখ্য গুণবাচক নামের বর্ণনা এসেছে। সূরাতুল ফাতেহার শুরুতেই আল্লাহর প্রশংসার ঘোষণার সাথে 'আল্লাহ' এই এসমে জাতের পাশে রাব্বুল আলামীন, আর রহমান, আর রহীম ও মালিকি ইয়াওমিদ্দিন-এর বর্ণনা আল্লাহর পরিচয়ের এক অনবদ্য উপস্থাপনা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঃ অর্থাৎ গোটা বিশ্বলোকের একক স্রষ্টাও তিনি, এ বিশ্বজাহানের প্রতিটি সৃষ্টির প্রয়োজনও তিনি এককভাবেই পূরণ করেছেন —এসব কিছুর একক মালিকানাও তাঁর। সর্বত্র একমাত্র তাঁরই হুকুম-আহকাম কার্যকর। এই বিশ্বলোকের সর্বত্র কেবলমাত্র তাঁরই কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত।

আর রাহমান আর রাহিম ঃ তিনি, কেবল তিনিই গোটা সৃষ্টির প্রতি বিশেষ করে মানবজাতির প্রতি করুণাময়, মেহেরবান। আসমান জমিনের সর্বত্র কেবল তাঁরই করুণা রাশির প্রকাশ ঘটছে। এই দয়ার, এই করুণার কোন শেষ নেই, সীমা নেই। সৃষ্টির সেরা মানুষ ইহজগতেও যেমন প্রতি পদে পদে তাঁর করুণার মুখাপেক্ষী তেমনি পরজগতেও।

মালিকি ইয়াওমিদ্দিন ঃ নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও একক অধিপতি আল্লাহ যেমন দাতা, দয়ালু, মেহেরবান তেমনি তিনি কঠোর এবং পরম পরাক্রমশালীও বটে। মানুষের এই দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় কার্যক্রমের একদিন বিচার হবে। সেই বিচার দিনের তিনি একক অধিপতি। তাঁর বিচারালয়ে সুপারিশ করার মত সাহস-হিম্মত প্রদর্শন করার মত দ্বিতীয় কোন সত্তা নেই।

এভাবে সূরায়ে বাকারার যে আয়াতটি আয়াতুল কুরসী নামে পরিচিত এবং অভিহিত সেখানে আল্লাহ তা'আলার কতকগুলো গুণের বর্ণনা এসেছে ঃ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○

"আল্লাহ সেই মহান সত্তা, তিনি ছাড়া সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আর কেউ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আসমান-জমীনের সবকিছুর তিনিই একক অধিপতি। কে আছে এমন যে তাঁর দরবারে তাঁর অনুমতি ছাড়াই কোন সুপারিশ করতে পারে ? তিনি মানুষের আগে-পিছের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে ওয়াকেফহাল, তাঁর জ্ঞানসমুদ্রের বারিবিন্দুও কেউ আয়ত্ত করতে পারে না। তবে তিনি যতটুকু আয়ত্ত করার তৌফিক দেন (ততটুকুই মানুষের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব)। তাঁর ক্ষমতা-প্রতিপত্তি তথা কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব আসমান-জমীনের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত। এ সবের হেফাজতে তিনি বিন্দুমাত্র ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হন না। বস্তুত তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ঠতম সত্তা।"

(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫)

বস্তুত এই প্রসিদ্ধ আয়াতটিতে আল্লাহর যে পরিচয় পাওয়া যায় তার সারকথা, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আর কেউ হতে পারে না। সৃষ্টিজগতের সর্বত্র যেহেতু একমাত্র তাঁরই সার্বভৌমত্ব কার্যকর সুতরাং মানুষের সমাজেও একমাত্র তাঁরই সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সার্বভৌম ক্ষমতার যথার্থ অধিকারী হতে হলে যেসব গুণাবলী অপরিহার্য একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো মধ্যে (কোন ব্যক্তির মধ্যেও নয়, কোন দলের মধ্যেও নয়—কোন জাতির মধ্যেও নয়) পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে নবী-রাসূলগণ আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাওয়াত দিতে গিয়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া এবং গায়রুল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করারই আহ্বান জানিয়েছেন। কালেমা তাইয়েবারও অন্তর্নিহিত রহস্য এটাই। যুগে যুগে নবী-রাসূলদের দাওয়াতের বিরোধিতায় সমসাময়িক রাষ্ট্রশক্তি এবং কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী মারমুখী ভূমিকারও মূল রহস্য এটাই।

এভাবে কুরআনের বিভিন্ন সূরায় আরো যেসব গুণবাচক নামের উল্লেখ রয়েছে, এক এক করে সবটার আলোচনা করতে পারলেই আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা আমাদের মনে-মগজে বদ্ধমূল হতে পারে। আল্লাহ তা'আলার এসব গুণবাচক নামগুলোর সবটাই গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ। তার মধ্যে রব, ইলাহ ও মালিক বিশেষভাবে ব্যাপক অর্থ বহন করে। এবং আমাদের বাস্তব জীবনের সাথে এর একটা সুদূর প্রসারী প্রভাব প্রতিক্রিয়াও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সূরায়ে আন নাসে মানুষের সাথে আল্লাহ তা'আলার সম্পর্ক উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ اِلٰـهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٥

"বল আমি আশ্রয় কামনা করছি মানুষের রব, মানুষের মালিক এবং মানুষের ইলাহর নিকট, বার বার বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের অনিষ্টকারিতা থেকে, যারা মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকে, জ্বীন অথবা মানুষের মধ্য থেকে।"–(সূরা আন নাস ঃ ১-৬)

মানুষ মনগড়া আইন-কানুন বিধি-বিধানের অনুসরণ করতে গিয়ে তাদের জীবনটাকে তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছে। পেটের চাহিদা পূরণের জন্যে এক ধরনের নিয়ম-নীতি বা প্রভুত্বের অনুসরণ করছে, মনের ক্ষুধা তথা আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের জন্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত নিয়ম-নীতি অনুসরণ করছে। আবার রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে ঠিক এর বিপরীত আদর্শের বা রীতি-নীতির অনুসরণ করছে। এভাবে মানুষের সমাজে তিন শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের জন্ম হয়েছে। দুনিয়ার ইতিহাসে প্রায় সব যুগে সবকালেই সাধারণ মানুষ এই তিন শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হয়ে আসছে।

(১) রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী (২) অর্থনৈতিক প্রাধান্য ও প্রতিপত্তির অধিকারী (৩) ধর্মীয় নেতৃত্ব ও পৌরহিত্যের অধিকারী। আল্লাহকে একযোগে মানুষের রব, ইলাহ ও মালিক মানার অর্থ মানুষের জীবন থেকে এই তিন শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের কর্তৃত্ব প্রভুত্ব অস্বীকার ও উৎখাত করে আল্লাহকেই সবকিছুর একক নিয়ামক মনে করা। অর্থনৈতিক জীবনেও একমাত্র আল্লাহর বিধানকেই কল্যাণকর মনে করা, রাজনৈতিক জীবনেও একমাত্র তাঁর সার্বভৌমত্বেই শান্তি ও কল্যাণ নিহিত বলে মনে করা এবং এককভাবে আল্লাহর বিধি-বিধানের মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন তথা

পারলৌকিক মঙ্গল হতে পারে বলে মনে করা এবং এককভাবে আল্লাহর বিধি-বিধানের মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন তথা পারলৌকিক মঙ্গল হতে পারে বলে দৃঢ়ভাবে আস্থা পোষণ করার নামই তৌহীদে বিশ্বাস করা। পক্ষান্তরে এর মধ্যে সামান্য যোগ-বিয়োগও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীর সামগ্রিক আলোচনায় একদিকে যেমন আল্লাহর করুণা, দয়া মেহেরবানী ও ক্ষমার বর্ণনা পাওয়া যায় তেমনি তার পাশাপাশি আল্লাহর ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও পরম পরাক্রমশালীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ভারসাম্যপূর্ণ গুণরাশির আলোচনা, চিন্তা ও গবেষণা মানুষের মনে একই সাথে আল্লাহ সম্পর্কে দু'টো বিপরীতমুখী মনোভাব সৃষ্টি করে থাকে। রহমান, রহীম, গফুর, আফুউন, করীম প্রভৃতি নাম থেকে যেমন মনে আল্লাহর দয়া মেহেরবানী ও ক্ষমা পাওয়ার আশায় মন আশান্বিত হয়ে উঠে তেমনি জব্বার, কাহ্হার, মালিক আজ্জিজুন-জুনতেকাম প্রভৃতির আলোচনায় চরম ভয়-ভীতির উদ্রেক হয়ে থাকে। বস্তুত এই দুই বিপরীতমুখী ধারণার একযোগে উপস্থিতির নামই ঈমান বা আল্লাহর সঠিক মারেফাত। 'আলঈমানু বায়নাল খাউফে ওয়ার রেজা।'

আল্লাহর কুদরতের বর্ণনা

আল্লাহর মারেফাত হাসেলের জন্যে চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগাবার দ্বিতীয় বিষয় হলো আল্লাহ তা'আলার কারখানায়ে কুদরত নিয়ে জ্ঞান-গবেষণা করা। আল্লাহর তৌহিদের প্রতি মনকে বিশ্বাসী করে তুলবার মত অগণিত উপাদান আসমান জমীনের সৃষ্টির মধ্যে, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে ছড়িয়ে আছে। আল্লাহ তা'আলার কুরআন তৌহিদ ও আখেরাতের সত্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার আহ্বান জানিয়েছে। যাদের পক্ষে এতবড় সৃষ্টি নিয়ে মাথা ঘামানো সম্ভব নয়—তাদের জন্যেও চিন্তার খোরাক রয়েছে—তার নিজের সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে। তাই কুরআন তৌহিদ ও আখেরাতের প্রমাণ ও নিদর্শন 'আফাক' অর্থাৎ সৃষ্টিলোক থেকে এবং আসফুস অর্থাৎ মানুষের জীবন থেকে সংগ্রহ করার ইঙ্গিত দিয়েছে।

সৌরজগতের প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহের নিজ নিজ কক্ষপথে সুনিয়ম, সুশৃংখলভাবে পরিভ্রমণ করা, এক চিরন্তন নিয়মে দিনের পর রাত রাতের পর দিনের আগমন, চিরন্তন নিয়মেই ঋতুর পরিবর্তন, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা, তরু-লতা প্রভৃতিতে একই চিরন্তন শাশ্বত নিয়মের কার্যকারিতা মানুষের মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাগিয়ে তোলে তৌহিদের অনুভূতি। তার মন বলে ওঠে ঃ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

"হে আমাদের মুনীব ! তুমি সৃষ্টিজগতের কোন একটিকেও অহেতুক সৃষ্টি করোনি। অতএব (আমরা বিশ্বাস করি, আখেরাত সত্য) আমাদেরকে দোযখের কঠিন ভয়াবহ শাস্তি থেকে মুক্তি দাও।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১)

এত সৃষ্টি রহস্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনার যোগ্যতা ও সুযোগ যার নেই তাকে লক্ষ্য করে কুরআন বলে ঃ

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ○ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ○ لا يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ

الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ○ ط اِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ○ ط

"মানুষের ভেবে দেখা উচিত, তাকে কোন সে জিনিস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষদেশ থেকে নিগৃত এক কাতরা লক্ষবান পানি থেকেই। যিনি তাদেরকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতে অবশ্যই সক্ষম।"

-(সূরা আত তারেক ঃ ৫-৮)

আল্লাহর প্রকৃত মারেফাত হাসিলের জন্যে তাই জিকিরের সাথে ফিকিরকে আল্লাহ তা'আলা নিজেই জুড়ে দিয়েছেন। বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي

الْاَلْبَابِ ○ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ

فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج

"আসমান জমীনের সৃষ্টি রহস্য ও দিবারাত্রির পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্যে আল্লাহর তৌহিদের নিদর্শন রয়েছে। যারা শয়নে স্বপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির করে এবং আসমান-জমীনের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১)

আল্লাহর নেয়ামতের গবেষণা

আল্লাহর মারেফাত হাসিলের তৃতীয় কার্যকর ও বাস্তব মাধ্যম হল আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। অগণিত অফুরন্ত নেয়ামত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর এবাদত-বন্দেগীর আহবান জানানোর সাথে সাথে তাঁর অগণিত নেয়ামতের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً ص وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের দাসত্ব ও গোলামী বন্দেগী কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, এভাবেই তোমরা নিষ্কৃতি লাভের আশা করতে পারো। যিনি আসমানকে চাঁদোয়ার মত এবং জমীনকে ফরাশের মত বানিয়েছেন, যিনি আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন অতপর জমীন থেকে নানা ফল-ফলাদি উৎপন্ন করে তোমাদেরকে রেজেক দান করে থাকেন। অতএব আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক কর না (ব্যাপারটা যে অন্যায়) তোমরা নিজেরাই এটা জান।"

—(সূরা আল বাকারা ঃ ২১-২২)

মাটির এ পৃথিবীতে আমরা আল্লাহ তা'আলার অগণিত, অফুরন্ত নেয়ামত ভোগ করছি। এর প্রত্যেকটিই আল্লাহর একত্বের, তৌহিদের সাক্ষ্য দিচ্ছে। মানুষের দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এক একটি অপূর্ব নেয়ামত এবং এরা সবাই আল্লাহর তৌহিদের সাক্ষী। আমার চোখ সে তো কেবল আল্লাহরই দান। দুনিয়ার কোন শক্তি, গোটা সৃষ্টি একত্রে মিলেও এর বিকল্প কোন নেয়ামত আমাকে দিতে পারে না। এভাবে আমার কান, আমার জিহ্বা, আমার নাক, আমার হাত, আমার পা, মাথা, আমার মন-মগজ তথা দেহের প্রতিটি সেল আল্লাহর একক দান যার কোন একটি বিকল হলে তার বিকল্প ব্যবস্থা করার সাধ্য কারো নেই।

আমার এ দুনিয়ার আলো বাতাসে তিলে তিলে বড় হওয়া, মানুষ হবার পেছনে আমার মা ও বাপের আদর-যত্ন সেও এক অপূর্ব নেয়ামত, যার বর্ণনা, মানুষের ভাষায় সম্ভব নয়। স্বয়ং আল্লাহ এটাকে তাঁর নিদর্শন হিসেবেই পেশ করেছেন। এভাবে আমরা মাটির এ পৃথিবীতে যেসব নেয়ামত ভোগ করে থাকি, সৌরজগতের রশ্মি কণা, তাতে যা যোগান দেয়—এ সবের যথার্থ অনুভূতি উপলব্ধি মানুষের মনকে কৃতজ্ঞতায় ভরে দেয়। আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন, তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামতের হিসেব নিতে চাও তাহলে চেষ্টা করে দেখতে পারো। পরিণামে ব্যর্থ হবে। আমরা দুনিয়ায় যেসব নেয়ামত ভোগ করছি, আল্লাহর ভাষায় তা অতি নগণ্য মাত্র। নগণ্য, সেই সাথে তা ক্ষণস্থায়ীও। আর

আল্লাহ্ তাঁর নিজের কাছে যা রেখে দিয়েছেন তাই উত্তম এবং স্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়ী এবং নগণ্য নেয়ামত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেই আমাদের চিন্তাশক্তি জবাব দিয়ে বসে। জ্ঞান-বুদ্ধি স্তম্ভিত হয়ে যায়। আর স্থায়ী ও উত্তম নেয়ামত যা আখেরাতের জিন্দেগীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা রেখে দিয়েছেন তা যে কত সুন্দর কত মনোরম, কত বিস্ময়কর তা কেবল তিনিই জানেন যিনি এসব নেয়ামতের একক স্রষ্টা।

আমরা এই পৃথিবীর নগণ্য ও ক্ষণস্থায়ী নেয়ামতের অদ্ভূত কারুকার্যতার দিকে সামান্য একটু দৃষ্টি দিয়ে দেখি, আল্লাহ কতবড় মহান স্রষ্টা, আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষ যে মাখলূকের দাসত্ব-গোলামী করে থাকে তারা কত শক্তিহীন। বাংলাদেশের কয়েকটি ফলমূলের সাজানো একটি থালা ছাফ করে খেয়ে ফেলার আগে একটু এসবের স্রষ্টার কথা ভাবুন। আপনার থালায় আম আছে, কাঁঠাল আছে, পেঁপে আছে, কলা আছে, আছে কিছু পেয়ারাও। এবার সুস্বাদু সুমিষ্ট এই ফলগুলো নিয়ে যারা গবেষণা করে থাকে তাদের জিজ্ঞেস করুন আমের স্বাদ কাঁঠালের মধ্যে আর কেউ সৃষ্টি করতে পারে ? আনারসের স্বাদ পেঁপের মধ্যে অথবা পেঁপের স্বাদ আমের মধ্যে সৃষ্টি করার মত কোন প্রক্রিয়া উদ্ভিদবিদ্যায় পারদর্শী কোন পন্ডিত আজ অবধি আবিষ্কার করতে পেরেছেন কি ? ভবিষ্যতের বিজ্ঞানের সাধনা যতই অগ্রসর হোক না কেন মৌলিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে তারা কি পারবে কোন অবদান রাখতে ? তারা যা পারবে তাতো কেবল মহান স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশলের স্বীকৃতি দান বৈ আর কিছুই নয়।

দুনিয়ার এই বৈষয়িক নেয়ামতের পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হল আল কুরআন। নেয়ামত দানকারী আল্লাহ্ রহমান দয়া করে, মেহেরবানী করে মানুষকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর অফুরন্ত নেয়ামতের তালিকায় কুরআন হল শীর্ষস্থানীয়। এই কুরআনের অনুসারী আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জন্যে যে নেয়ামত রেখে দেয়া হয়েছে সেরূপ নেয়ামতের সাথে দুনিয়ায় কোন মানুষের চোখের সাক্ষাত হয়নি। দুনিয়ায় কোন মানুষের কান অনুরূপ নেয়ামতের বর্ণনা শোনেনি। কোটি কোটি মানুষের কল্পনা বিলাসী মন অনুরূপ নেয়ামতের কথা কোনদিন কল্পনায়ও আনতে পারেনি। এই জগতে আল্লাহ্ প্রদত্ত বৈষয়িক নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে কুরআন রূপ শ্রেষ্ঠ নেয়ামতের যথার্থ সদ্ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমে যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পারবে, আখেরাতে আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামত ভোগ করার সুযোগ কেবল তাদেরই ভাগ্যে জুটবে।

আইয়ামুল্লাহ

আল্লাহর যথার্থ মারেফাত হাসিলের অন্যতম মাধ্যম আল্লাহর দিনসমূহের আলোচনা ও তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা। আল্লাহর নবীদের দাওয়াতকে

অস্বীকার করে অতীতে যেসব জাতি আল্লাহর গজবে ধ্বংস হয়েছে, সেইসব জাতির ধ্বংস হবার দিনগুলোতে মানুষের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হবার কারণে ওগুলো আইয়ামুল্লাহ নামে অভিহিত। ওগুলোকে কিয়ামতে ছোগরাও বলা হয়ে থাকে। আল্লাহর দিনসমূহের সর্বশেষ দিন "ইয়াওমুদ্দীন" নামে পরিচিত। অতীতে আল্লাহর নাফরমানি করে যারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে তাদের ধ্বংসের কাহিনী আল্লাহর শক্তিমত্তার যথার্থ অনুভূতি জাগায় আমাদের মনে। ঐসব ঘটনাবলী থেকে আমরা যথার্থ শিক্ষাও লাভ করতে পারি। হযরত নূহ (আ)-এর কওম কেন ধ্বংস হল? নমরূদের কি পরিণাম হলো। ফেরাউন কেমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পেল। কওমে লূতকে কিভাবে সমূলে ধ্বংস করা হল, ...কওমে আদ, কওমে সামুদ কিরূপ শাস্তি ভোগ করল—এসব ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন নবী মুহাম্মদ (সা)। এর পাশে কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের বর্ণনা, বিচার দিবসে আল্লাহর জাব্বারিয়াত ও কাহহারিয়া-রিয়াতের প্রকাশ মানুষের আমলনামা দেখার জন্যে দৌড়াবার অবর্ণনীয় দৃশ্য, আদালতে আখেরাতে আল্লাহর একক কর্তৃত্বে পরিচালিত বিচারের কঠিন ও কঠোরতম দৃশ্য। এসব কিছু নিয়ে চিন্তা- গবেষণা করে মানুষ যথার্থ অর্থে আল্লাহর সঠিক মারেফাত হাসিল করতে পারে।

আল্লাহর উবুদিয়াত

আল্লাহ তা'আলার সঠিক মারেফাত বা সঠিক পরিচয় মানুষের সামনে উদঘাটিত হবার সাথে সাথে তার মন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর উবুদিয়াত গ্রহণ করবে। সূরাতুল ফাতেহার প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরার পর মানুষের জবানে একথা ঘোষণা করানো ঃ

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

"হে খোদা, আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য কামনা করি" কিসের ইঙ্গিত বহন করে? একটু গভীরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এ প্রশ্নের উত্তর আপনাকে বলে দেবে, আল্লাহর সঠিক পরিচয় সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হবার পরে মানুষের পক্ষে আল্লাহতে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে এটাকে তুলে ধরা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) তারকা নিয়ে গবেষণা করলেন, চন্দ্র-সূর্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেন, তার কাছে সুস্পষ্ট হল এসবের একটিও রব বা ইলাহ হতে পারে না। তাই তার জাতিকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন ঃ

يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝ اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

"হে আমার জাতি তোমরা যেসব কিছুকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করছ আমি সেগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি। আমি সবকিছু থেকে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করে একমুখী হয়ে ধাবিত হচ্ছি সেই আল্লাহর দিকে যিনি আসমান-জমিনের স্রষ্টা এবং আমি কখনো মুশরিকদের অন্তরভুক্ত নই।"—(সূরা আল আনআম ঃ ৭৮-৭৯)

এভাবে হযরত মূসা (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মারেফাত বা পরিচয় সম্পর্কে জানালেন, তাকে নবুয়াতের দায়িত্ব দিলেন এবং সাথে সাথেই নির্দেশ দিলেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার।

اِنَّنِىْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ۝

"নিশ্চিত জেনে নাও আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। অতএব একমাত্র আমারই ইবাদত কর, নামায কায়েম কর আমাকে স্মরণ রাখার জন্যে।"—(সূরা আত ত্বাহা ঃ ১৪)

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আল্লাহর সঠিক মারেফাতের অনিবার্য দাবী অনুযায়ী মানুষ আল্লাহকেই একমাত্র মুনীব হিসেবে গ্রহণ করবে এবং নিজকে উক্ত মুনীবের একনিষ্ঠ দাস বা গোলাম মনে করবে। এভাবে আল্লাহকে একমাত্র মুনীব মানা এবং নিজকে কেবলমাত্র তাঁরই দাস মনে করা শুধু মনের ধারণা বিশ্বাস আর মুখের ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। বাস্তবে নিজের জীবন থেকে গায়রুল্লাহর গোলামী ও দাসত্বমূলক যাবতীয় কার্যক্রমকে দূরীভূত করতে হবে। মানুষের অনুরূপ কার্যক্রমের মূলোৎপাটন করে সর্বত্র আল্লাহর গোলামী ও বন্দেগী সঠিক অর্থে প্রতিষ্ঠা করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

আল্লাহর প্রকৃত দাসত্ব ও বন্দেগীর কাজটা কিভাবে করতে হবে এ ব্যাপারে হযরত মূসা (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা তার মারেফাত এবং নবুয়াত দান করেই যে নির্দেশ দিলেন তা থেকে আমরা বাস্তব পথনির্দেশ লাভ করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে প্রথমে একথা জানালেন যে, "আল্লাহ ছাড়া ইলাহ বা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সত্তা আর কেউ নেই।" তার সাথে সাথে জানালেন—"একমাত্র তাঁরই ইবাদত বা দাসত্ব করতে হবে।" এই দাসত্ব করার জন্যে বা সদাসর্বদা আল্লাহর আদেশ-নির্দেশের কথা স্মরণ করার জন্যে সালাত কায়েম করতে হবে। এভাবে আল্লাহকে মানার এবং কেবলমাত্র তাঁরই গোলামী এবং দাসত্ব করার এই নির্দেশেরই আওতায় হযরত মূসা (আ)-কে তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসক ফেরাউনের দরবারে যাবার নির্দেশ দেয়া হল। বলা হল ঃ "সে আমার রাজত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।" কুরআনুল করীমের এই অংশের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি দিকে ও বিভাগে আল্লাহর হুকুম-আহকাম মেনে চলার এবং গায়রুল্লার আইন-কানুন, বিধি-বিধান পরিহার করে চলার নামই প্রকৃত ইবাদত। এভাবে আল্লাহর ইবাদত করার পথে বাধা- প্রতিবন্ধক হল খোদাহীন বা খোদাদ্রোহী রাষ্ট্রশক্তি। সুতরাং উক্ত রাষ্ট্রশক্তিকে আল্লাহর অনুগত বানানো অথবা পরাভূত করে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার যথার্থ সংগ্রাম-সাধনায় আত্মনিয়োগ করাকেই সঠিক অর্থে আল্লাহর উবুদিয়াত গ্রহণ করা বলে। নামায এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ইবাদত প্রকৃতপক্ষে এই উবুদিয়াতের দায়িত্ব পালনে সহায়তা দান বা যোগ্যতা সৃষ্টির জন্যেই অপরিহার্য করা হয়েছে। উবুদিয়াতের আসল পথে যাত্রা শুরু করে যারা ঐসব আনুষ্ঠানিক ইবাদতের সাহায্য গ্রহণ করে তারাই এসবের যথার্থ ফল লাভে সক্ষম হয়ে থাকে। বলা হয়েছে, "ছবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনা কর।" এ সাহায্য কিসের জন্যে ? উবুদিয়াতের দায়িত্ব পালন ছাড়া আর অন্য কিছুর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়নি।

নবী মুহাম্মদ (সা) তাঁর নবুয়াতের জিন্দেগীর দ্বাদশতম বছরে পদার্পণ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ পেলেন। রোযা এবং যাকাতের নির্দেশ পেয়েছেন আরো পরে। তাহলে এতদিন তিনি যে কাজটা করলেন সেটা কি ছিল ? রসূলে মকবুল (সা)-এর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব বা কাজ একটিই ছিল আর তাহলো আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা। কুরআন বলে ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ـ

"আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি রসূলকে পাঠিয়েছেন আলহুদা এবং দ্বীনে হক সহকারে। আল্লাহর দ্বীনকে মানব রচিত যাবতীয় দ্বীনের উপরে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে।"—(সূরা আত তাওবা ঃ ৩৩)

নবুয়াত প্রাপ্তির পর থেকে নবী মুহাম্মদ (সা) এবং তার অনুসারীগণ আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে প্রাণান্তকর সংগ্রাম শুরু করেছেন। চলার পথে বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন পর্যায়ে এই আনুষ্ঠানিক ইবাদতগুলো বিশেষ করে নামায এবং রোযা ফরয করা হয়েছে। সুতরাং আনুষ্ঠানিক ইবাদতগুলোকে উবুদিয়াতের মূল দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোন অবকাশ নেই। অনুরূপভাবে উবুদিয়াতের ঐ মূল দায়িত্বকেও আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার উপায় নেই। কারণ, এই মূল দায়িত্ব পালনের প্রকৃত শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক যিনি তিনি এগুলোকে কখনও বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। এগুলোর উপরে তিনি নিজে যেমন যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তেমনি তাঁর সাথীগণ, সম্মানিত সাহাবাগণও (রা) এগুলোর প্রতি যথার্থ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাইতো রসূলে পাকের (সা) সাথীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তারা রাতে দরবেশ আর দিনে অশ্বারোহী বীরযোদ্ধা" আল্লাহর সত্যিকারের বান্দা সত্যিকারের আব্‌দ-এর এটাই হল আসল পরিচয়। সুতরাং 'উবুদিয়াত' যে এ কাজটাই এতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলার সাথে তার বান্দাদের সঠিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে 'উবুদিয়াতের' এই কঠিন দায়িত্ব যুগে যুগে পালন করেছেন নবী ও রসূলগণ। আর নবী-রসূলদের অনুসারী হিসেবে যারা এ দায়িত্ব আনজাম দিয়েছেন আল কুরআনে তারা সিদ্দিকীন, শোহাদা এবং সালেহীন নামে পরিচিত। নবী-রসূলগণ এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পদে পদে আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়েছেন। নবীদের অনুসারী আল্লাহর প্রিয় বান্দা, নেয়ামত প্রাপ্ত বান্দা, সিদ্দিকীন শোহাদা এবং সালেহীন নামে পরিচিত ব্যক্তিরাও প্রতি পদে পদে আল্লাহর নুসরত ও রহমতের প্রত্যাশী হয়েছেন। আর এই সাহায্য পাওয়ার জন্যেই আল্লাহ তা'আলা সবর ও সালাতকে অবলম্বন করবার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে নবী-রসূল (আ) ও আল্লাহর অন্যান্য প্রিয় বান্দাদের অনুসারীদের পদাংক অনুসরণ করে আল্লাহর অভিশপ্ত বান্দা এবং পথভ্রষ্টদের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত হলেই সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যেতে পারে।

আল্লাহকে রব বা মুনীব মানায়, নিজেকে একমাত্র তারই বান্দা বা দাস বানাবার আসল তাৎপর্য এবং অনিবার্য দাবী যে এটাই একথা বুঝবার জন্যে বেশী দূরে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর' মধ্যেই এর সুস্পষ্ট ঘোষণা বিদ্যমান। এখানে কেবল আল্লাহকে ইলাহ মানার কথাই বলা হয়নি বরং গায়রুল্লাহর ইলাহিয়াত অস্বীকার ও উৎখাতের কথা আগে বলা হয়েছে ঃ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى قَ
لَاانْفِصَامَ لَهَا ط

এভাবে যারা "খোদাদ্রোহী শক্তিকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দেয় তারাই মজবুত রজ্জু আঁকড়ে ধরে, যা কখনও ছিন্ন হবার নয়।"—(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬)

এই মজবুত রজ্জু আঁকড়ে ধরাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করা। যাকে আমরা উবুদিয়াত নামে অভিহিত করে আসছি।

উবুদিয়াতের সম্পর্ক রক্ষা করার উপায়

আল্লাহ তা'আলাকে রব ও ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে আমরা একমাত্র তাঁরই দাসত্ব এবং গোলামী ও বন্দেগীর ওয়াদা করে থাকি। এভাবে ঈমানের ঘোষণাকে আল্লাহ তা'আলা কেনা-বেচার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط
يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ قف وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى
التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا
بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

"যারা ঈমানের ঘোষণা দিয়েছে, আল্লাহ তাদের জান ও মাল বেহেশতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। (এখন তাদের একমাত্র কাজ হল) তারা

আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে এবং জীবন দেবে ও জীবন নেবে। এ ব্যাপারে তৌরাত, ইঞ্জিল এবং কুরআনে আল্লাহর কৃত ওয়াদা একইভাবে সত্য এবং অবধারিত। আর কে আছে আল্লাহর চেয়ে বেশী ওয়াদা পূরণকারী ? অতএব তোমাদের এই চুক্তির জন্যে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) শুভ সংবাদ গ্রহণ কর। এটাই বড় সাফল্য।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ১১১)

এই চুক্তিবদ্ধ লোকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো ঃ

اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (التوبه : ١١٢)

"তারা তাওবাকারী, এবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, আল্লাহর পথে ভ্রমণকারী, রুকূ'কারী ও সেজদাকারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী এবং অসৎকাজে বাধাদানকারী, সর্বোপরি আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখার হেফাজত-কারী এবং মু'মিনদেরকে শুভ সংবাদ দাও।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ১১২)

অনুরূপভাবে এ পথের পথপ্রদর্শক ও একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ শিক্ষক নবী মুহাম্মদ (সা)-এর আগমন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ؕ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز (الفتح : ٢٨ - ٢٩)

"আল্লাহ সেই মহান সত্তা, যিনি রসূল পাঠিয়েছেন সঠিক পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহকারে, যাতে করে আল্লাহর দ্বীনকে যাবতীয় দ্বীনের উপরে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। আর এই মহাসত্য সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তার সাথী-সঙ্গীগণের পরিচয় হলো তারা কুফরীর মুকাবিলায় বজ্রের ন্যায় কঠোর এবং পরস্পরের প্রতি রহম দিল। তুমি দেখতে পাবে তারা আল্লাহর সমীপে রুকূ' এবং সেজদায় নিয়োজিত। তারা নিয়োজিত আল্লাহর করুণা এবং সন্তোষলাভের চেষ্টা ও সাধনায়।"–(সূরা আল ফাতাহ ঃ ২৮-২৯)

আল কুরআনের উল্লেখিত দু'টি অংশের আলোকে আমরা আল্লাহর সাথে বান্দার সঠিক সম্পর্ক যেমন নির্ধারণ করতে পারি, তেমনি সে সম্পর্ককে বৃদ্ধি করার উপায়েরও সন্ধান পাই।

প্রথম অংশের সারকথা

মানুষ ঈমানের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহর উবুদিয়াত গ্রহণ করে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে তার জান ও মাল বিক্রি করে থাকে, অন্য কথায় সোপর্দ করে থাকে। সুতরাং এই বিক্রির শর্তানুসারে আখেরাতে আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার স্বরূপ বেহেশত পেতে হলে তাকে তার নিজের জান, নিজের মাল আর নিজের খেয়াল খুশীমত ব্যবহার করা চলবে না। এ জান, এ মালের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। এ জান এ মাল মূলতঃই তাঁর দেয়া। ঈমানের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহর কাছে এ দু'টো সোপর্দ করার মাধ্যমে আসল মালিকের কাছেই তা তুলে দেয়া হয়ে থাকে। সুতরাং এবার দু'টোকে কেবল সেই সব কাজেই ব্যবহার করা যাবে যেসব কাজে ব্যবহার করা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন। আল্লাহ এগুলোকে কোন্ কাজে ব্যবহার পছন্দ করেন তাও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। যারা এভাবে ঈমানের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহর কাছে বেহেশতের বিনিময়ে জান ও মাল বিক্রি করেছে তারা কেবল একটি পথেই এ জান ও মাল ব্যবহার করতে পারবে। আর তা হবে আল্লাহর পথে চূড়ান্ত ও প্রাণান্তকর সংগ্রামের পথে যাত্রা শুরু করে আর থেমে যাওয়ার বা ফিরে আসারও উপায় নেই। এ পথের চূড়ান্ত সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য, কুফরী শক্তির মূলোৎপাটন অথবা নিজে শেষ হয়ে যাওয়া।

দ্বিতীয় অংশের সারকথা

মানুষকে সত্যিকার অর্থে গায়রুল্লাহর গোলামী ও দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর গোলাম ও দাস বানাবার এই কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রেরিত শেষ নবীর প্রকৃত মিশন ছিল আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ীরূপে প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের আলোচিত অংশ দু'টির প্রথমটিতে যেমন মু'মিনের সংজ্ঞা দেবার পর তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি মহানবী (সা)-এর আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার পর এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে যে যোগ্যতা ও গুণাবলী থাকা অপরিহার্য রসূল এবং তাঁর সাথীদের মধ্যে সেই গুণরাশি আছে বলে কুরআন সাক্ষী দিচ্ছে।

আমরা যারা মহান মালিক আল্লাহ তা'আলার সাথে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই, চাই তার নৈকট্য লাভ করতে, তাদেরকে অবশ্যই ঐসব গুণাবলী অর্জন করতে হবে। তাই অংশ দু'টির আলোকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি বা

তার নৈকট্য লাভের জন্যে যেসব কাজ আঞ্জাম দেয়া আমাদের জন্য অপরিহার্য তা নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লার ঘোষণার বাস্তবায়ন বা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। আল্লাহর জমীনে এবং মানুষের জীবনে আল্লাহর আইন-কানুন, বিধি-বিধান জারী করার মানসে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার সংগ্রামে জানের কুরবানী এবং মালের কুরবানী পেশ করতে হবে। মানুষের সমাজকে ফেতনা মুক্ত করার জন্য আল্লাহর দ্বীনের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা এবং কুফরী ও তাগুতী শক্তির উচ্ছেদ প্রচেষ্টা যুগপৎভাবে চালাতে হবে।

দুই ঃ এ কাজ যারা করবে তাদেরকে যুগপৎভাবে দু'টি বিপরীতমুখী গুণের, অন্য কথায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। কুফরী ও তাগুতী শক্তিসমূহের প্রতি হতে হবে কঠোর এবং আপোষহীন। কিন্তু পরস্পরের প্রতি, সাথী বন্ধুদের প্রতি হতে হবে রহম দিল, বিগলিত প্রাণ ও সংবেদনশীল।

তিন ঃ এই কঠোরতা ও কোমলতার মধ্যে ভারসাম্য আনতে সাহায্য করবে নামায—উত্তম নামায। আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিনয়ী মনোভাব—যা অর্জিত হয় একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দরবারে রুকূ' এবং সেজদা করার মাধ্যমে।

চার ঃ এই রুকূ' এই সেজদা এবং সেই সাথে তাদের যাবতীয় কার্যক্রম সংগ্রাম-সাধনার প্রেরণার উৎস হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা, একমাত্র আল্লাহর করুণা ও মেহেরবানী পাওয়ার উপযুক্ত হওয়া।

পাঁচ ঃ কঠোরতা ও কোমলতার প্রতীক আল্লাহর পথের এই সৈনিকদের, আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার প্রাণান্তকর সংগ্রাম সাধনায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটবে তাদের যাবতীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে। চাল-চলনে, আচার-ব্যবহার সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু হবে যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও করুণা লাভ করা সুতরাং তাদের মন ও মগজ সবসময় নিয়োজিত থাকবে আল্লাহর ধ্যান, সত্যিকারের জিকর ও জিকরের মূর্তপ্রতীক হবে তারা। তাদের মন-মগজের এই পবিত্রতার ছাপ পড়বে তাদের চেহারা এবং চরিত্রের উপরে। উত্তম আখলাকের এই লোকদের চেহারাও হয় তাই ঈমানের আলোকে উদ্ভাসিত। সেজদার প্রভাবে হয় দিপ্তীমান।

ছয় ঃ আল্লাহর সন্তোষ যাদের কাম্য তাদেরকে আল্লাহর অসন্তোষ থেকেও অবশ্যই বাঁচতে হবে। যেসব কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, সেগুলো আনজাম দেবার সাথে সাথে ঐসব কাজ বর্জন করারও চেষ্টা করতে হবে, যেসব কাজ করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু দুর্বল মানুষ এ ব্যাপারে চেষ্টা-সাধনাই করতে পারে,

পুরোপুরি সফল হওয়া সে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভুলত্রুটি হয়ে যাওয়া সে তো একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। আল্লাহ ক্ষমাশীল গফুর এবং রহীম। তিনি এসব ভুলত্রুটি থেকে রেহাই পাবার জন্য তওবার দ্বার খোলা রেখেছেন। তওবার অর্থ ফিরে আসা। কোন দুর্বল মুহূর্তে ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে অনুতাপ-অনুশোচনা করে আল্লাহর কাছে সে ভুলের জন্যে ক্ষমা চাওয়া এবং সঠিক পথে ফিরে আসাকেই সত্যিকারের তওবা বলা হয়ে থাকে। এভাবে তওবার ফল ভোগ করা কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর সন্তোষ লাভ ও অসন্তোষ বর্জনে চেষ্টা চালায় এবং এই চেষ্টায় কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলো কিনা এ ব্যাপারে নিজেই নিজের হিসেব নেয়। হযরত আলীর ভাষায় "হাসেবু কাবলা আনতুহাসেবু"—আল্লাহর কাছে হিসেব দেয়ার আগে তুমি নিজেই নিজের হিসেব নাও। এভাবে আল্লাহর কাছে জান ও মাল বিক্রি যারা করেছে আল্লাহর পথে সংগ্রামের শপথ যারা নিয়েছে তওবা তাদের প্রথম ও প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে—যার অর্থ এই শপথের আলোকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে তারা আত্মসমালোচনা করে অভ্যস্ত।

সাত ঃ মানুষের জীবনে এবং আল্লাহর জমীনের সর্বত্র যারা আল্লাহর, কেবলমাত্র আল্লাহর বন্দেগী এবং দাসত্ব কায়েম করতে চায়—চায় গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি উৎখাত করতে তাদের ব্যক্তি জীবনটা হতে হবে আল্লাহর ইবাদতের মূর্তপ্রতীক। সার্বক্ষণিক ইবাদতের যোগ্যতা অর্জনের জন্যে আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহের হক তাদের পুরোপুরি আদায় করতে হবে। একান্ত নিষ্ঠার সাথে নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ প্রভৃতিকে তারা পালন করবে হৃদয় মনের ষোলআনা আবেগ-অনুভূতি এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে। বিশেষ করে নামাযকে তারা গ্রহণ করবে মেরাজ বা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের মাধ্যম রূপে।

আট ঃ তারা সৃষ্টিজগতের কারো কাছে মাথা নত করবে না সুতরাং কারো স্তব-স্তুতি, প্রশংসারও ধার ধারবে না। তারা প্রশংসা করবে একমাত্র আল্লাহর। "আল্লাহু আকবার ওলিল্লাহিল হামদ" হবে তাদের নিত্যকার বুলি। আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা, আল্লাহর তারিফ করা, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের, সার্বভৌমত্বের ঘোষণায় নিয়োজিত থাকবে তাদের মন ও জবান। তাদের মুখে সদা উচ্চারিত হবে "সবুহানাল্লাহে ওয়াল হামদু লিল্লাহে লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার।" "আল্লাহু আকবার কাবিরা, আলহামদু লিল্লাহে কাছিরা, সুবহানাল্লাহে বুকরাতীওঁ ওয়া আছিলা।" "সুবহানাল্লাহে ওয়াবেহামদিহি সুবাহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বেহামদিহি আস্তাগফেরু" প্রভৃতি তসবিহসমূহ।

নয় ঃ পরম তৃপ্তির সাথে তারা আল্লাহর দরবারে রুকূ' করবে, সেজদা করবে। আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে তাঁর সমীপে সেজদা, পরিপূর্ণরূপে

সেজদা করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ "সেজদা কর এবং নৈকট্য হাসেল কর।"

দশ ঃ আল্লাহর দরবারে প্রাণভরে রুকূ' ও সেজদা করে পরম তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করে এই লোকগুলো ঘরে বসে যায় না। মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। মানুষের সমাজ ছেড়ে কোন নির্জন-নিরালা পরিবেশে সন্যাস জীবনও গ্রহণ করে না বরং তারা মানুষের সমাজে আল্লাহর জমীনে ঘুরে-ফিরে তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালায়। আল্লাহর দ্বীনের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা আল্লাহর জমীন চষে বেড়ায়। এ পথে চলতে গিয়ে বৈষয়িক জীবনের মোহ তাদের পথ আগলে দাঁড়াতে পারে না।

এগার ঃ এভাবে তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর হুকুম পালনের নির্দেশ দেয়, আর গায়রুল্লাহর—খোদাদ্রোহী শক্তির অনুসরণে বাধাদান করে। মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করা এবং অসৎপথ থেকে বিরত রাখার কঠিন দায়িত্ব তারা কঠোরভাবে পালন করে।

বার ঃ এদের আসল পরিচয় হলো আল্লাহর সৈনিক। তাই সৈনিকের ভূমিকায় তারা আল্লাহর দেয়া সীমারেখার পাহারাদারী করবে। ন্যায়-অন্যায়ের যে সীমা আল্লাহ দিয়েছেন, সত্য-মিথ্যার যে সীমা আল্লাহ দিয়েছেন, হালাল-হারামের যে সীমারেখা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, মানুষ যাতে তা লংঘন করতে না পারে, সে জন্যে আল্লাহর উবুদিয়াত যারা গ্রহণ করেছে তাদেরকে সদা জাগ্রত অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হবে। এই খবরদারীর কাজ, এই পাহারাদারীর কাজ যত কষ্টসাধ্যই হোক না কেন তাকে অবশ্যই আনজাম দিতে হবে। প্রয়োজনে জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে।

উপরে বর্ণিত কঠিন ও কষ্টসাধ্য দায়িত্বগুলো পালন করতে গিয়ে আল্লাহর যেসব বান্দা মাঝে-মধ্যে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হন, মাঝে মধ্যে বাধাগ্রস্ত হন, মাঝে মাঝে ভেঙ্গে পড়েন, মাঝে মাঝে হতাশা–নিরাশায় পেয়ে বসতে চায়, তখনই তাদের জন্যে আল্লাহর বাণী "আল্লার সাহায্য কামনা কর ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে" অমৃতসুধা হয়ে সামনে আসে। তখন এই বাণী শুনতে এবং এর উপর আমল করতে কত যে মজা লাগে তা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়। যার ব্যাপার সে নিজেই কেবল বাস্তবে উপলব্ধি করতে পারে।

আল্লাহর যেসব বান্দা তার আমলের মাধ্যমে বাস্তব কর্মতৎপরতার মাধ্যমে এই স্তরে উপনীত হয়, তাকে এক পর্যায়ে সৃষ্টিজগতের সবকিছুর উপরে নির্ভরশীলতা ছেড়ে দিয়ে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করতে হয়। এই মুহূর্তে আল্লাহকে প্রাণ ভরে ডাকতে হয়—এ ডাকে যেমন মজা পাওয়া যায়

তেমনি এ ডাকে মহান মালিক আল্লাহ তায়ালা সাড়া দিয়ে থাকেন অত্যন্ত দ্রুততার সাথে। এমনি এক মুহূর্তে, এমনি এক স্তরে এসেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۙ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝
هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ۝ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚ وَاَعَدَّ لَهُمْ
اَجْرًا كَرِيْمًا ۝

"হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহকে বেশী বেশী করে স্মরণ কর। সকাল-বিকাল অর্থাৎ সারাক্ষণ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর। তিনি তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, আর তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণের জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে ধাবিত করতে চান। তিনি তো মু'মিনদের প্রতি বড়ই মেহেরবান।"—(সূরায়ে আহযাব ঃ ৪১-৪৪)

এখানে এসে আল্লাহ তাঁর বান্দার দৃষ্টি এই দুনিয়ার ঊর্ধে আখেরাতের দিকে নিয়ে যান। তাদের এই জীবনের প্রাণান্তকর সাধনা ও সংগ্রামের সর্বোত্তম পুরস্কার আখেরাতের পুরস্কার। কাজেই দুনিয়ার প্রতিকূলতায় যদি কারো জীবনে জাগতিক সাফল্য না-ও আসে তাতেও কিছুই যায় আসে না। যে দিন তারা আল্লাহর সান্নিধ্য পাবে, আল্লাহর দিদার লাভ করবে, আল্লাহর সামনে হাজির হবে, সেদিন তাদেরকে আসমান-জমীনের মালিক, আরশে আজিমের মালিক সাদর সম্ভাষণ জানাবেন, সালামের মাধ্যমে তাদেরকে খোশ আমদেদ জানাবেন। সেখানে তিনি ঈমানদারদের জন্যে, আল্লাহর উবুদিয়াতের সঠিক মান রক্ষা-কারীদের জন্যে সম্মানজনক পুরস্কারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আখেরাতের জীবনের জন্যে আল্লাহর ওয়াদাকৃত এই সর্বোত্তম পুরস্কার, মহাসম্মানের পুরস্কার লাভের কামনা-বাসনা যার মনে যত তীব্র, উবুদিয়াতের হক আদায় করা, দুনিয়ার সর্বপ্রকারের বাধা-প্রতিবন্ধকতা ও ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে আল্লাহর সাথে যথার্থ সম্পর্ক রক্ষা করে চলা, উত্তরোত্তর এ সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি করা তাদের পক্ষে ততই সহজতর হয়ে যায়।

জিকির ও দোয়া

আল্লাহর নৈকট্যলাভের প্রধানতম কার্যকর উপায় হল জিকির এবং দোয়া। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ ـ (البقرة : ١٥٢)

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব।"

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط

"তোমরা আমার কাছে দোয়া কর আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।"—(সূরা আল মু'মিন ঃ ৬০)

প্রকৃতপক্ষে বান্দা যখন আল্লাহকে ডেকে সাড়া পাওয়ার নিশ্চয়তা পায় এবং আল্লাহও যখন তার কোন বান্দাকে স্মরণ করেন, তখনই তো সে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়। অবশ্য, জিকির ও দোয়া আপাতঃ আলাদা আলাদা মনে হলেও মূলতঃ দোয়া জিকিরেরই একটা উপায়মাত্র। আমরা এই পুস্তিকায় জিকিরের গুরুত্ব, জিকিরের অর্থ ও জিকিরের পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। সেই সাথে দোয়া কি ? দোয়ার প্রয়োজনীয় উপাদান ও পদ্ধতি কি—সে সম্পর্কেও একটা ভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

জিকিরের গুরুত্ব

(১)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۙ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝ (الاحزاب : ٤١-٤٢)

"হে ঈমানদারগণ, বেশী বেশী করে আল্লাহর জিকির কর। আর সকাল-সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ঘোষণা কর।"

(২)

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ۝ (البقر : ١٥٢)

"আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আমার শুকরিয়া আদায় কর, না শুকরী করো না।"—(সূরা আল বাকারা ঃ ১৫২)

৩

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ○

"তোমার রবের জিকির কর বেশী বেশী করে, আর তার পবিত্রতা ঘোষণা কর সকাল-সন্ধ্যায়।"—(সূরা আলে ইমরান ঃ ৪১)

৪

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَاتَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ـ(الاعراف : ٢٠٥)

"তোমার রবের জিকির কর মনে মনে, ব্যাকুলতা ও ভীতি সহকারে, উচ্চস্বরে নয়। এভাবে জিকির কর সকাল-সন্ধ্যায়। আর কখনও এ ব্যাপারে উদাসীন হবে না।—(সূরা আল আরাফ ঃ ২০৫)

৫

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً ط (المزمل : ٨)

"তোমার রবের নামের জিকির কর এবং সবকিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর।"—(সূরা আল মুজ্জাম্মিল ঃ ৮)

৬

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاًo(الدّهر : ٢٥)

"তোমার রবের নামের জিকির কর সকালে-বিকালে।"

৭

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ج

"অতপর যখন তোমরা নামায আদায় শেষ করবে, তখন আল্লাহর জিকির করবে দাঁড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায়ও।"-(সূরা আন নিসা : ১০৩)

(৮)

فَاذْكُرُوْا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ○(الاعراف : ٧٤)

"অতপর আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ কর। এ পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে না।"—(সূরা আল আরাফ : ৭৪)

(৯)

خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُم بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ○(الاعراف : ١٧١)

"তোমাদের কাছে আমরা যা নিয়ে এসেছি তা আঁকড়ে ধর শক্ত করে, আর এর মধ্যে যা কিছু আছে তা স্মরণ কর। যাতে করে তোমরা মুক্তি লাভে সক্ষম হও।"—(সূরা আল আরাফ : ১৭১)

এভাবে আমরা আল কুরআনের অসংখ্য আয়াতে জিকিরের নির্দেশ পাই। কুরআন এই জিকিরের ব্যাপারটিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে, যা থেকে মনে হয়, আল্লাহর জিকিরই সকল ইবাদতের সারকথা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ○

"নামায কায়েম কর আমার জিকিরের জন্য।"—(সূরা আত ত্বাহা : ১৪)

اَقِمِ الصَّلٰوةَ ط اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط

"নামায কায়েম কর নিশ্চয়ই নামায ফাহেশা ও মুনকার থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং নিসন্দেহে আল্লাহর জিকির বড় কথা বা প্রধান বিষয়।"—(সূরা আনকাবুত : ৪৫)

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى○

"সে-ই সফলকাম হবে, যে পবিত্রতা অর্জনে সচেষ্ট হয়, আল্লাহর নামের জিকির করে এবং নামায আদায় করে।"—(সূরা আল আ'লা : ১৪-১৫)

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا -

"নামায শেষে আল্লাহর জমীনে ছড়িয়ে পড়। আল্লাহর ফজল অর্থাৎ হালাল রিজিক তালাশ কর এবং বেশী বেশী করে আল্লাহর জিকির কর।"
—(সূরা আল জুমআ : ১০)

এভাবে আল্লাহ তা'আলা যে জিকিরের উপর এতবেশী গুরুত্ব দিয়েছেন, তার হক আদায় করতে হলে জিকির কাকে বলে এবং জিকিরের উপায় ও পদ্ধতি কি তা ভালভাবে জেনে নেয়া একান্তই অপরিহার্য।

জিকিরের অর্থ

জিকিরের শাব্দিক অর্থ হলো কোন কিছু স্মরণ করা, আবার বর্ণনা করাও হয়। কোন কিছু মনে রাখা বা মনে করাকে আমরা মনের জিকির বলতে পারি। আর কোন কিছু মুখে আলোচনা করাকে আমরা মুখের জিকির বলতে পারি। জুময়ার নামাযের নির্দেশ দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اِذَا نُوْدِىَ الصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ -

"জুমআর দিনে যখন নামাযের জন্য ডাকা হয় তখন আল্লাহর জিকিরের জন্য দ্রুত হাজির হও।"—(সূরা আল জুমআ : ৯)

এখানে জিকির বলতে জুমআর খুৎবাকে বুঝানো হয়েছে। যার মাধ্যমে মুসুল্লীদেরকে আল্লাহর কথা, আল্লাহর হুকুম-আহকামের কথা শোনানো হয়ে থাকে। খুৎবা পুরাদস্তুর একটা বক্তৃতা। আল্লাহ তা'আলা তাকেও জিকির নামে অভিহিত করেছেন।

আল্লাহর জিকির আল কুরআনের এক বিশেষ পরিভাষা। কুরআন এটাকে তার নিজস্ব একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছে। আল কুরআনের যেসব আয়াতে জিকির কথাটির উল্লেখ আছে সেগুলোর দিকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে দৃষ্টি দিলে সেই বিশেষ অর্থ আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি।

জিকরুল্লাহর প্রথম দাবী হলো—ঈমানদারের মনে আল্লাহর জাত, ছিফাত ও হুকুম-আহকাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা গভীরভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

জিকরুল্লাহর দ্বিতীয় দাবী হলো—আল্লাহর জাত, ছিফাত ও হুকুম-আহকাম সংক্রান্ত যে সঠিক ধারণা তার মনে ও মগজে প্রতিষ্ঠিত আছে তাকে আরো ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য মুখে আলোচনা করবে। অপরকেও এ ধারণা দানের জন্য এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করবে।

জিকরুল্লাহর তৃতীয় দাবী হলো—মন-মগজের প্রতিষ্ঠিত এই ধারণার আলোকে তার আমলী জিন্দেগীকে পরিচালনা করবে।

জিকরে কালবী

ঈমানে মুযমালে আল্লাহর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিতে গিয়ে আমরা যেভাবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এবং তার হুকুম-আহকাম মেনে নেবার অঙ্গীকার করে থাকি, মূলতঃ এটা আল্লাহর সাথে কৃত একটি ওয়াদা। মনে-মগজে সবসময়ের জন্য এই ওয়াদা বা অঙ্গীকারের কথা স্মরণ রাখার নাম জিক্‌রে কালবী বা মনের জিকির।

ঈমানে মুযমালের মধ্যে মূলতঃ আমরা তিনটি অঙ্গীকার করে থাকি।

এক ঃ আল্লাহর জাতের যে পরিচয় তিনি নবী-রাসূলদের মাধ্যমে বিশেষ করে সর্বশেষ নবী ও সর্বশেষ কেতাবের মাধ্যমে দিয়েছেন তার জাত সম্পর্কে এ থেকে কোন ভিন্ন ধারণা পোষণ করি না। তিনি তার জাতের যে পরিচয় দিয়েছেন আল কুরআনে—বিশেষ করে সূরায়ে এখলাসে সেই পরিচয়কে সামনে রেখেই আমরা তার জাতকে এক এবং অদ্বিতীয় মনে করি। আরো বিশ্বাস করি, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কারো ঔরষজাত নন। তার ঔরষসেও কেউ জন্মায়নি। তার সমকক্ষ কেউই হতে পারে না।

দুই ঃ আল্লাহ তা'আলা তার গুণাবলীর যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটাকেও আমরা হুবহু বিশ্বাস করি। আরো বিশ্বাস করি তার জাতে যেমন কোন শরীক নেই, তেমনি ছিফাত বা গুণাবলীতেও কারো শরীকানা নেই।

তিন ঃ আল্লাহ তা'আলার জাত ও ছিফাতের প্রতি নির্ভেজাল ও যথার্থ বিশ্বাস পোষণের অনিবার্য দাবী স্বরূপ তার যাবতীয় হুকুম-আহকাম, আদেশ-নিষেধ মেনে চলার অঙ্গীকারের দাবী হলো, আল্লাহর নির্দেশ কোন্‌টি আর নিষেধ কোন্‌টি সে সম্পর্কে মন এবং মগজকে সজাগ সচেতন রাখতে হবে। এ জন্য যেমন আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হয়েছে ঃ "হে আল্লাহ ! হককে হক হিসেবে বুঝার এবং তা অনুসরণের তৌফিক দাও আর বাতিলকে বাতিল হিসেবে চিনে তাকে বর্জন করার তৌফিক দাও।" তেমনি হক ও বাতিলকে জানা এবং গ্রহণ বর্জনের জন্যে বাস্তব পদক্ষেপও নিতে হবে। এভাবে

আল্লাহর হুকুম-আহকাম তথা হক-বাতিলের ধারণা মনে এবং মগজে বদ্ধমূল ও সজাগ সচেতন রাখতে হয়। এই তিনটি বিষয় মনে-মগজে এভাবে জাগরুক রাখার প্রক্রিয়া ও প্রচেষ্টাকেই আমরা মনের জিকির বা জিক্‌রে কালবী হিসেবে উল্লেখ করতে পারি।

জিকরে লিসানী

উক্ত বিষয় তিনটি মনে গেঁথে রাখার প্রয়োজনে অথবা আল্লাহর আরো বান্দাদের শিখাবার প্রয়োজনে এগুলো মুখে উচ্চারণ করতে হয়, আলাপ-আলোচনা করতে হয়, অনুশীলন করতে হয়। এটাকেই আমরা মৌখিক জিকির বা জিকরে লিসানী নামে অভিহিত করব।

জিকরে আমলী

উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো নিষ্ঠার সাথে যদি কেউ মনে বদ্ধমূল করে নেয় এবং নিষ্ঠার সাথে মুখে এ বিষয়ে আলোচনা করে তাহলে তার বাস্তব জীবন এর বিপরীত পথে চলতে পারে না। শুধু তাই নয় বরং ইতিবাচকভাবে অন্তরের বিশ্বাসের প্রকাশ ও প্রতিনিধিত্ব যেমন মুখের কথায় হবে তেমনি বাস্তব জীবনের যাবতীয় কার্যক্রম, লেন-দেন, আমল-আখলাকের মাধ্যমেই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। এটাকেই আমরা বাস্তব জিকির বা জিকরে আমলী নামে অভিহিত করতে পারি।

অন্য কথায় আমরা মুখের জিকিরকে মৌখিকভাবে সত্যের সাক্ষ্য দানকারী এবং আমলী জিকিরকে বাস্তবে সত্যের সাক্ষ্য দানকারী নামেও অভিহিত করতে পারি।

তিন পর্যায়ের জিকিরের উদাহরণ

আল্লাহর জাত সম্পর্কে মনে মগজে সঠিক ধারণা বিশ্বাস পোষণ করা কলবের জিকির। এই ধারণা-বিশ্বাসের ঘোষণা দান অর্থাৎ 'আল্লাহর জাতে কাউকে শরীক মানি না' একথার ঘোষণা দান জবানের জিকির। বাস্তবে আল্লাহর জাতে কাউকে শরীক না করা জিকরে আমলী। আল্লাহর ছিফাত বা গুণাবলী সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণ করা এবং তার গুণাবলীতে কাউকে শরীক মনে না করা কলবের জিকির। মুখে এই বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার কথা ঘোষণা করা এবং প্রচার করা মুখের জিকির বা জিকরে লিসানী। বাস্তবেও আল্লাহর গুণাবলীতে কাউকে অংশীদারিত্ব না দিয়ে নির্ভেজাল তৌহিদের অনুসারী হিসেবে জীবনযাপন করার নাম জিকরে আমলী।

এমনিভাবে কোথায় আল্লাহর কোন হুকুম কিভাবে মানতে হবে, কি কি কাজ আল্লাহ করতে বলেছেন আর কি কি করতে বারণ করেছেন, সেটা মনে

গেঁথে নেবার নাম কলবের জিকির। যেমন, আল্লাহ নামায কায়েম করতে বলেছেন, রোযা রাখতে বলেছেন, যাকাত দিতে বলেছেন, হজ্জ করতে বলেছেন, মদ, জুয়া ও সুদ বর্জন করতে বলেছেন, ওজনে কম দিতে বারণ করেছেন, নিকট আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে বলেছেন। আল্লাহর এই নির্দেশগুলো মন-মগজে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা কলবের জিকির। আর এটা মুখে মুখে আলোচনা করার (নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির জন্য অথবা অন্যকে শোনাবার ও শিখাবার জন্য) নাম মুখের জিকির বা জিকরে লিসানী। আর বাস্তবে এ কাজগুলো আনজাম দেবার নাম বাস্তব জিকির বা জিকরে আমলী।

জিকিরের উপায় ও পদ্ধতি

জিকিরের সুন্নাত তরিকা সম্মত উপায় তিনটি। (১) সালাত (২) তেলাওয়াতে কুরআন (৩) মাসনুন তরিকার জিকিরসমূহ এবং নবী (সা)-এর শিখানো দোয়াসমূহ।

সালাত

প্রকৃতপক্ষে আমাদেরকে সার্বক্ষণিকভাবে উপরোল্লিখিত তিন পর্যায়ের জন্য প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ করে সালাত। সালাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সূরায়ে ত্বাহাতে বলা হয়েছে ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ٥

"সালাত কায়েম কর আমার জিকিরের জন্য।"—(সূরা ত্বাহা ঃ ১৪)

সূরায়ে আনকাবুতে বলা হয়েছে ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط

"সালাত কায়েম কর, নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও নীতি গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। অবশ্য আল্লাহর জিকিরই হলো সবচেয়ে বড় কথা।"—(সূরা আনকাবুত ঃ ৪৫)

প্রকৃতপক্ষে সালাত আমাদেরকে তিন প্রকারের জিকিরেরই ট্রেনিং দিয়ে থাকে। সালাতে আমরা বেশ কিছু দোয়া ও কালাম শুধু মনে মনে পাঠ করে থাকি। এর মাধ্যমে কলবের জিকিরের ট্রেনিং হয়। কিছু দোয়া ও কালাম প্রকাশ্যে উচ্চারণ করে থাকি। এর মাধ্যমে মুখের জিকির বা জিকরে লিসানির ট্রেনিং হয়। আর বাস্তবে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে তার সামনে আদবের সাথে দাঁড়ানো, রুকূ' ও সেজদার মাধ্যমে তার কাছে

বাস্তবে আত্মসমর্পণ প্রভৃতি কাজের ভেতর দিয়ে বাস্তব জিকির বা জিকরে আমলীর ট্রেনিং হয়।

তেলাওয়াতে কুরআন

সালাতের পর সুন্নত তরিকা সম্পন্ন সর্বোত্তম জিকির হলো তেলাওয়াতে কুরআন। আল কুরআনের অন্যতম নাম জিকর। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّكۡرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوۡنَ ○

"আমি আযযিকর নাযিল করেছি আমিই এর হিফাজত করব।"

—(সূরা আল হিজর ঃ ৯)

এখানে আযযিকর বলতে আল কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। সেই সাথে আল্লাহর ঘোষণা ঃ

لَقَدۡ يَسَّرۡنَا الۡقُرۡاٰنَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِنۡ مُّدَّكِرٍ ○

"আমি অবশ্য অবশ্যই কুরআনকে জিকিরের জন্য (এখানে জিকির অর্থ নসিহত কবুল করা) সহজ করেছি। অতএব কেউ আছে কি যে এ থেকে নছিহত গ্রহণ করতে পারে ?"—(সূরা আল ক্বামার ঃ ২২)

আল কুরআনের তেলাওয়াত সালাতের ভেতরেও হতে পারে, আবার সালাতের বাইরেও হতে পারে। রাসূল পাক (সা) সাধারণত কুরআন পাকের বড় বড় সূরাগুলো শেষ রাতে সালাতুত তাহাজ্জুদের ভেতর এবং শয্যা গ্রহণের আগে ২৭, ২৮ ও ২৯ পারার অন্তর্ভুক্ত সূরাগুলোর ন্যায় একাধিক ছোট সূরা পাঠ করতেন।

আমরা আমাদের সুবিধামত তেলাওয়াতের জন্য কোন নির্দিষ্ট নিয়ম বানিয়ে নিতে পারি। আবার কোনরূপ নির্দিষ্ট নিয়ম ছাড়াও যখন তখন আল্লাহর কুরআন দেখে হোক, না দেখে হোক, সালাতের মধ্যে হোক আর সালাতের বাইরেই হোক তেলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি।

তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে যেমন সহীহ করে তেলওয়াতের যোগ্যতা অর্জন অপরিহার্য তেমনি এর অর্থ বোঝার যোগ্যতা অর্জন করাও অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে, অর্থ না বুঝে তেলাওয়াত করলে সেই তেলাওয়াতের মাধ্যমে জিকিরের ফায়দা পাওয়া সম্ভব নয়। কুরআন তো এই অর্থে জিকর যে, এর মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম-আহকাম, আদেশ-নিষেধের সাথে পরিচিত হওয়া যায়। সেই সাথে জানা যায় ঐ আদেশ-নিষেধ মানা না মানার পরিণাম ও পরিণতির কথা। অর্থ না বুঝলে তা কি করে জানা যাবে ?

দোয়া

জিকিরের তৃতীয় উপায় দোয়া। আল্লাহ্ নিজে তার কিতাব কুরআনুল করীমে অসংখ্য দোয়া নিজেই তার বান্দাহকে শিখিয়ে দিয়েছেন। যেন, আমরা সেই ভাষায় তার কাছে দোয়া করি। শুধু তাই নয়, তিনি আমাদেরকে তার কাছে দোয়া করার হুকুম দিয়েছেন। যেহেতু তার হুকুম পালনের নাম ইবাদত অতএব দোয়াও ইবাদত, বরং দোয়াকে مخ العبادة ইবাদতের সারবত্তা বলা হয়েছে।

আল্লাহ যেমন দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং দোয়ার ভাষা শিখিয়ে দিয়েছেন তার প্রিয় নবীও তার উম্মতকে আল্লাহ্র নৈকট্যলাভের জন্য সালাতের এবং তেলওয়াতে কুরআনের পাশাপাশি আল্লাহ্র কাছে আমাদের যে কোন প্রয়োজনে দোয়া করার জন্য তাকিদ দিয়েছেন। দোয়ার ক্ষেত্রে আল কুরআনের ভাষায় দোয়া করার উপর যেমন তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনি আল্লাহ্রই নির্দেশে (অহীয়ে গায়রে মাতলুর-মাধ্যমে) তিনি নিজেও কিছু দোয়ার ভাষা শিখিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া আমাদের দিন রাত্রির বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কাজ-কর্মের মধ্যে যাতে আমরা সবসময়ের জন্য আল্লাহর জিকিরে নিয়োজিত থাকতে পারি এ জন্যও তিনি বিশেষ বিশেষ তাসবিহাত ও দোয়া শিখিয়েছেন। এগুলোর উপর আমল করলে আমরা আল্লাহ্র চাহিদা মোতাবেক সারাক্ষণ জিকিরে মশগুল থাকতে পারি। আমাদের যাবতীয় কার্যক্রমের ভিতর দিয়েই আল্লাহর জিকির করতে পারি। আল্লাহর চাহিদা তিনি এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

"(জ্ঞানী তারাই) যারা আল্লাহর জিকির করে, দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং শায়ীত অবস্থায়। আর গবেষণা করে আসমান-জমীনের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে। (এভাবে তারা তৌহিদ ও আখেরাতের যৌক্তিকতা ও বাস্তবতার সন্ধান পায় এবং ঘোষণা করে) হে আমাদের পরোয়ারদেগার, তুমি এই সৃষ্টিজগতের কিছুই অর্থহীন করে সৃষ্টি করনি। অতএব আমাদেরকে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দাও।"

—(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১)

দোয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে তিনটি জিনিস দোয়াকারীর কাছে পরিষ্কার হতে হয়।

এক ঃ কার কাছে দোয়া করছে ? তার সঠিক পরিচয়, সঠিক মর্যাদা ও সঠিক শক্তিমত্তার পরিচয় জানা আছে কি ?

দুই ঃ যার কাছে দোয়া প্রার্থী দোয়া করছে তার সাথে তার সম্পর্ক আছে কি ? থাকলে সে সম্পর্ক কিসের ?

তিন ঃ কিসের জন্য দোয়া করবে, কি চেয়ে দোয়া করবে।

প্রকাশ থাকে যে, এই বিষয়ে আমরা এ পুস্তিকার শুরুতে কিছুটা ইঙ্গিত করে এসেছি। বরং এই বিষয়টাই আমাদের এ পুস্তিকার মূল বিষয় হিসেবে আলোচিত হয়ে এসেছে। উল্লেখিত তিন বিষয় ছাড়া দোয়ার ক্ষেত্রে আরো তিনটি বিষয় জানা দরকার। দোয়া কোন মন্ত্র নয় যে পাঠ করলেই মতলব সিদ্ধ হয়ে যাবে। বরং দোয়া আমাদের অন্যতম ইবাদত। যার হক আদায় করতে পারলে প্রার্থীত কোনকিছু পেয়ে যাওয়াই বড় কথা নয়, আল্লাহকে খুশী করাও সম্ভব। দোয়ার প্রতিটি কথার জন্য আমাদের আমলনামায় অবশ্য অবশ্য সওয়াব জমা হবার কথা।

দোয়ার ক্ষেত্রে আমরা আরো যে তিনটি জিনিসের কথা উল্লেখ করতে চাই তার প্রথমটি হলো, দোয়া প্রার্থী যে বিষয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে চায় সে জিনিসটা পাওয়ার জন্য তাকে প্রথমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয় হলো, এ সিদ্ধান্ত ও সংকল্প অনুসারে তাকে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। তৃতীয়টি হলো, তার বাঞ্ছিত জিনিস বা কাজ হাসিলের জন্য সাধ্যমত প্রাণান্তকর চেষ্টা-সাধনা করতে হবে। কিন্তু সাফল্যের জন্যে নিজের চেষ্টার উপর ভরসা না করে আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করবে। এবং চেষ্টা-সাধনার হক আদায়ের সাথে সাথে আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে ধরণা দিবে। আল্লাহর সাহায্যের জন্য একান্ত কাতর কণ্ঠে তার মনের ইচ্ছা, কামনা-বাসনা ব্যক্ত করবে। এভাবে যারা কোন নেক কাজের সিদ্ধান্ত ও সংকল্প গ্রহণ করে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে এবং আল্লাহর সাহায্যের জন্য কাকুতি মিনতি করে তাদের মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছিয়ে দেয়া আল্লাহ তার দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط

"যারা আমার পথে সাধনা ও সংগ্রাম করে আমি অবশ্যই তাদের আমার পথের সন্ধান দিয়ে থাকি।"—(সূরা আল আনকাবুত ঃ ৬৯)

দোয়ার অন্যতম আদব হলো দোয়া প্রার্থী আল্লাহর সঠিক পরিচয়কে সামনে রেখে আল্লাহর শাস্তির ভয় ও রহমতের আশা নিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিজকে আল্লাহর কাছে সপে দিবে। মৃত ব্যক্তি গোসলদানকারীর হাতে

যে অবস্থায় থাকে, (তার নিজের কিছুই করার থাকে না, গোসল দানকারী যখন যেদিক খুশী ঘুরাতে ফিরাতে পারে) বান্দা আল্লাহর কাছে অনুরূপভাবেই তার অসহায়ত্ব তুলে ধরে প্রাণ উজাড় করে আল্লাহর সাহায্য চাইবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মনের গোপন বাসনাও জানেন। অতএব, খুব উচ্চৈস্বরে দোয়া করার প্রয়োজন পড়ে না। অন্ততঃ আল্লাহকে শোনানোর জন্য এভাবে জোরে জোরে চিল্লাচিল্লি করার কোনই দরকার নেই। তবে নিজের মনে আল্লাহর শাস্তির ভয় ও রহমতের আশার আবেগ আপ্লুত ভাব সৃষ্টির জন্য নিজেকে শুনানোর মত নিয়ন্ত্রিত আওয়াজ করা যেতে পারে। এতে অন্ততঃ দোয়ার ভাষাগুলোর অর্থ ও তাৎপর্য মন-মগজের উপর এমন কি আমলী জিন্দেগীর উপরও প্রভাব প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তিনি সব মানুষের স্রষ্টা। সব মানুষকে তিনি ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব তার কাছে আমরা যে কোন ভাষায় আমাদের মনের কথা ব্যক্ত করতে পারি। এমনকি মুখের ভাষা ছাড়া মনের অব্যক্ত কামনা-বাসনাও তিনি জানেন এবং বুঝেন। কাজেই, যে যেভাবে খুশী, যে ভাষায় খুশী আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারে। কিন্তু যেহেতু আমাদের কিসে কল্যাণ আর কিসে অকল্যাণ হবে, এ ব্যাপারে আমাদের সঠিক জ্ঞান নেই। আমরা যা কিছু আমাদের জন্য কল্যাণকর মনে করি বাস্তবে তা আমাদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে, আবার যেগুলোকে অকল্যাণকর মনে করি সেগুলো কল্যাণকর হতে পারে—তাই, আল্লাহ ও তার রাসূল যেসব দোয়া শিখিয়েছেন সে সব দোয়ায় কি কি কথাগুলো বলা হয়েছে সেগুলো বুঝা একান্তই অপরিহার্য। এখন যদি কারো পক্ষে আরবী দোয়া আয়ত্ব করা সম্ভব না হয়, তাহলে ঐসব দোয়ার বাংলা অর্থ মনে রেখে নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে সে সবকিছু চেয়ে দোয়া করলেও নিশ্চয় ফায়দা পাওয়া যাবে।

দোয়ার গুরুত্ব

আমরা আল্লাহর কুরআনের এবং তার রাসূলের শিখানো দোয়াগুলোর কিছু অংশ অর্থসহ এ পুস্তিকায় উল্লেখ করতে প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। তার আগে দোয়ার গুরুত্ব প্রসঙ্গে কয়েকটি আয়াত ও হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

আয়াত

(১)

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ۝ (المؤمن : ٦٠)

"তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দিব। গর্ব অহংকার বশতঃ যে আমার ইবাদাত পাশ কাটিয়ে যায়, অতিসত্বর তারা অবশ্য অবশ্যই লাঞ্ছিত অবস্থায় দোযখে প্রবেশ করবে।"

(২)

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ۝

"তোমাদের রবকে ডাকো জড়সড় হয়ে এবং চুপে চুপে। তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"—(সূরা আল আ'রাফ ঃ ৫৫)

(৩)

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ لا فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ۝

"আমার বান্দারা আমার ব্যাপারে জানতে চাইলে বলে দিও, আমি অবশ্য অবশ্যই তাদের অতি নিকটে আছি। যখনই কেউ আমার কাছে দোয়া করে আমি সাথে সাথেই তাতে সাড়া দিয়ে থাকি। অতএব তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি যথাযথভাবে ঈমান পোষণ করে, একথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও, যাতে করে তারা হেদায়াতের মনজিলে মকসুদে পৌছতে সক্ষম হয়।"—(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৬)

(৪)

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْيَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا۝

"যারা খারাপ কাজ করে বসে অথবা নিজের নফসের উপর জুলুম করে অতপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তারা আল্লাহকে ক্ষমাশীল পাবে।"—(সূরা আন নিসা ঃ ১১০)

হাদীস

(১)

تَضَرَّعُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَادْعُوْهُ فِى الرَّخَاءِ فَاِنَّ اللّٰهَ قَالَ مَنْ دَعَانِىْ فِىْ

الرَّخَاءِ اَجَبْتُهُ فِى الشِّدَّةِ وَمَنْ سَأَلَنِى اَعْطَيْتُهُ وَمَنْ تَوَضَعَ لِى رَفَعْتُهُ وَمَنْ تَضَرَّعَ اِلَى رَحْمَتِهِ وَمَنِ اسْتَغْفَرَلِى غَفَرْتُ لَهُ - (الحديث الربيع)

"তোমাদের রবের নিকট কাকুতি-মিনতি কর, তোমার সুসময়ে তাকে ডাকো, কেননা আল্লাহ্ বলেছেন, যে আমাকে তার সুসময়ে ডাকবে আমি দুঃসময়ে তার ডাকে সাড়া দিব। যে আমার কাছে চাইবে আমি তাকে দিব। যে আমার কাছে বিনয়ী হবে আমি তাকে উঁচু মর্যাদা দান করব। আর যে আমার কাছে কাকুতি-মিনতি করবে আমি তার প্রতি করুণা করব। আর যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে তাকে আমি ক্ষমা করব।"

—(মিনহাজুচ্ছালেহীন)

(২)

خَيْرُ الدُّعَاءِ الاِسْتِغْفَارُ

"উত্তম দোয়া হল ইস্তেগফার।"—(বুখারী)

(৩)

مَامِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّىْ فَيَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ ثُمَّ قَرَأَ وَالَّذِيْنَ اِذَافَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْابِهِمْ وَمَن يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَافَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (بخارى)

"কোন মানুষ গুনাহের কাজ করার পর যদি অজু করে নামায পড়ে, এক আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তাহলে আল্লাহ তাকে অবশ্য অবশ্যই মাপ করে থাকেন। অতপর আল্লাহর রাসূল কুরআন থেকে এই অংশটুকু তেলাওয়াত করলেন ঃ '(জান্নাতীদের পরিচয়) তারা যখন কোন ফাহেশা কাজ করে ফেলে, অথবা নিজেদের নফসের উপর জুলুম করে বসে, সাথে সাথেই আল্লাহর কথা স্মরণ করে অতপর তার কাছে তাদের গোনাহের মাফ চায়—এরপর এরূপ গোনাহের কাজ তাদের জ্ঞাতসারে বার বার সংগঠিত হয় না। আল্লাহ ছাড়া তো আর কেউ গোনাহ মাফ করতে পারে না।"

—(বুখারী)

(৪)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَيَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرُ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً -(بخارى)

"হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে একথা বলতে শুনেছি, খোদার কসম আমি দিনে সত্তুর বারেরও বেশী তাওবা এবং এস্তেগফার করে থাকি।"—(বুখারী)

আল কুরআনের দোয়া

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

"হে আমাদের মুনীব, আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতের কল্যাণ দান কর। আর বাঁচাও দোযখের আগুন থেকে।"

—(সূরা আল বাকারা ঃ ২০১)

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ○

"হে আমাদের প্রভু, আমাদেরকে ধৈর্যধারণের ক্ষমতা দাও। আমাদের কদমকে সুদৃঢ় কর এবং কাফেরদের উপর বিজয় দান কর।"

—(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫০)

رَبَّنَا لاَتُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَانَا ج رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ج وَاعْفُ عَنَّا وقفه وَاغْفِرْلَنَا وقفه وَارْحَمْنَا وقفه اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ○

হে আমাদের রব, আমরা যদি ভুল করে থাকি বা ছোটখাট ত্রুটি করে থাকি তাহলে তুমি সেগুলোর ব্যাপারে আমাদেরকে পাকড়াও করো না। আমাদের উপর সেই রূপ কঠিন বোঝা (পরীক্ষা বা আযাব) চাপিয়ো না যেরূপ বোঝা চাপিয়েছ আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। আর তেমন বোঝাও চাপিও না যেমনটি বহনের শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদের

ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা কর। অপরাধ ক্ষমা কর। আমাদের উপর রহম কর। তুমি আমাদের প্রভু। অতএব আমাদেরকে কাফেরদের উপর বিজয় দান কর।"—(সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৬)

رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ۝

"প্রভু হে, একবার যখন দয়া করে হেদায়াত দান করেছ অতএব আর কখনও আমাদের দীলকে বাঁকা পথে যেতে দিও না তোমার পথ থেকে। আমাদের উপর রহমত বর্ষণ কর। তুমি অবশ্যই মহান দাতা।"
—(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮)

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ۝

"হে আমাদের রব আমাদের গোনাহ্ মাফ কর এবং আমাদের কাজে কোন বাড়াবাড়ী হয়ে থাকলে তাও ক্ষমা কর। আমাদের কদমকে মজবুত কর। আর কাফেরদের উপর বিজয় দান কর।"—(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৭)

رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۝ رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ۖ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ۝ رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۗ رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ـ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَاوَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۖ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ۝

"হে আমাদের রব, তুমি এ সৃষ্টিজগতের কোন কিছুই অর্থহীনভাবে সৃষ্টি করনি। তুমি পূতঃপবিত্র। অতএব আমাদের দোযখের আগুন থেকে নাজাত দাও। প্রভু হে, তুমি যাদেরকে দোযখে ঢুকাবে তাকে অবশ্য অবশ্যই লাঞ্ছিত করে ছাড়বে। আর কোন জালেমের জন্য সেদিন কোন সাহায্যকারী থাকবে না। প্রভু হে, আমরা একজন আহ্বানকারীকে এই মর্মে আহ্বান করতে শুনেছি, 'তোমাদের রবের পথে ঈমান আন।' অতপর আমরা ঈমান এনেছি। অতএব, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের গোনাহ্ মাফ কর। ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা কর। আর আমাদেরকে তোমার

নেক বান্দাদের সাথে থাকার তৌফিক দিও। প্রভু হে, তুমি তোমার রাসূলের মাধ্যমে আমাদেরকে যা কিছু দেবার ওয়াদা করেছ তা দাও। কিয়ামতের সেই দিনে আমাদের লাঞ্ছিত কর না। তুমি তো কখনই ওয়াদা খেলাপ কর না।"—(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১-১৯৪)

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا سكه وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ○

"হে আমাদের রব ! আমরা তো আমাদের নফসের উপর জুলুম করেছি। তুমি যদি ক্ষমা না কর, রহমত না কর, তাহলে তো আমরা অবশ্য অবশ-্যই ধ্বংস হয়ে যাব।"—(সূরা আল আরাফ ঃ ২৩)

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ○

"হে আমাদের পরোয়ারদেগার, আমাদেরকে ক্ষমা কর আর আমাদের ঐ সকল ভাইদেরকে ক্ষমা কর যারা ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী। আমাদের মনে কোন ঈমানদারের জন্যে কোন প্রকারের সংকীর্ণতা ও ঈর্ষাপরায়ণতার ভাব সৃষ্টি হতে দিও না। তুমি তো অতীব দয়ালু এবং মেহেরবান।"—(সূরা আল হাশর ঃ ১০)

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قف اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ○

"হে আসমান-জমীন তথা গোটা বিশ্বপ্রকৃতির স্রষ্টা, তুমি আমার ইহকালেরও প্রভু, পরকালেরও প্রভু। তুমি আমাকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করার তৌফিক দিও। আর তোমার নেক বান্দাদের মধ্যে আমাকে শামিল কর।"—(সূরা ইউসুফ ঃ ১০১)

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ق رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ○

"হে আমার মুনীব ! আমাকে, আমার সন্তানদেরকে সালাত কায়েমকারী বানাও। হে পরোয়ারদেগার, আমার দোয়া কবুল কর।"

—(সূরা ইবরাহীম ঃ ৪০)

رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ○

"হে আমাদের পরোয়ারদেগার, আমাকে, আমার মা-বাপকে ও সমস্ত মুসলিমদেরকে সেই দিনে রক্ষা কর, যেদিন আমাদের সবার হিসেব হবে।"—(সূরা ইবরাহীম ঃ ৪১)

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ○

"হে পরোয়ারদেগার, আমাদের মা-বাপের প্রতি তেমনি দয়া কর, যেমন দয়া মায়া সহ তারা আমাদেরকে ছোটবেলায় লালন-পালন করেছেন।"
—(বনি ইসরাঈল ঃ ২৪)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ○

"হে আমাদের রব, আমাদেরকে এমন জীবন সাথী এবং সন্তান দাও যাতে আমাদের চক্ষু শীতল হয়। আর আমাদের সবাইকে মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য আদর্শ রূপে গড়ে উঠার তৌফিক দাও।"
—(সূরা আল ফুরকান ঃ ৭৪)

রসূলুল্লাহ (সা)-এর দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ وَاِلَيْكَ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ (البيهقى)

"হে আল্লাহ, সকল প্রশংসা তোমারই। সকল বাদশাহী তোমারই। সবকিছু আবার ফিরে যাবে তোমারই কাছে। সবকিছুর অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।"—(বাইহাকী)

"হে আল্লাহ তোমার কাছে আমাকে সোপর্দ করছি। তোমার উপর ঈমান এনেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি। যাবতীয় কাজে তোমারই কাছে ধরণা দেই, তোমারই নামে তোমার শত্রুর সাথে লড়াই করি। তোমারই নাজিল করা কিতাবের ভিত্তিতে যাবতীয় ফায়সালা গ্রহণ করি। অতএব আমি যা কিছু করেছি তার জন্যে ক্ষমা কর। আর যা কিছু করতে পারিনি তার জন্যেও ক্ষমা কর। [অথবা আমার আগের ও পরের অপরাধ ক্ষমা কর] আর আমি যা গোপনে করেছি আর প্রকাশ্যে করেছি, তার সবই ক্ষমা কর। তুমিই এগিয়ে দেবার মালিক, তুমি পিছিয়ে দেবার মালিক। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।" অন্য রেওয়ায়েতে ঃ"লা হাওলা ওলা কুউয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ" বর্ণিত আছে।
—(বুখারী, মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى ـ(مسلم)

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং আত্মনির্ভশীলতা কামনা করি।"—(মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ـ

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا ـ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَيَنْفَعُ ـ وَمِنْ قَلْبٍ لاَيَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ

لاَتَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوِهِ لاَيَسْتَجَابُ لَهَا ـ (مسلم)

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই, যাবতীয় অপারগতা, অলসতা এবং ভীরুতা থেকে, কৃপণতা এবং বার্ধক্য থেকে আর কবরের আযাব থেকে। আল্লাহ তুমি আমার নফসকে তাকওয়া দান কর এবং পরিশুদ্ধ ও উন্নত কর। কেননা, একমাত্র তুমিই তাকে উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ ও উন্নত করতে পার। হে আল্লাহ, তোমার কাছে ঐ জ্ঞান থেকে আশ্রয় চাই, যে জ্ঞান কোন উপকারে আসবে না। ঐ দীল থেকে আশ্রয় চাই, যে দীল তোমাকে ভয় করে না। ঐ নফস থেকে আশ্রয় চাই, যে নফস পরিতৃপ্ত হয় না। আর ঐ দোয়া থেকে আশ্রয় চাই, যে দোয়া তোমার দরবারে কবুল হয় না।"—(মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً وَرِزْقًا طَيِّبًا ـ (احمد)

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান, গ্রহণযোগ্য আমল এবং পবিত্র রিজিক চাই।"—(আহমদ)

اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِىْ بِمَا عَلَّمْتَنِىْ وَعَلِّمْنِىْ مَايَنْفَعُنِىْ ـ

"হে আল্লাহ, আমাকে যে জ্ঞান দান করেছো, তাকে আমার জন্য কল্যাণকর বানাও। আর আমাকে সেই জ্ঞান দান কর যা আমাকে কল্যাণ দিবে।"—(তিবরানী ও তিরমিজি)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلاَقِ ـ

"হে আল্লাহ, আমি অবশ্য অবশ্যই তোমার কাছে ভাগ্য বিপর্যয় থেকে, মুনাফেকী থেকে এবং চরিত্রহীনতা থেকে আশ্রয় চাই।"

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِعْمَتِكَ وَجَمِيْعُ سَخَطِكَ ـ

"হে আল্লাহ, আমি তোমার নিয়ামত প্রাপ্তির পর তা থেকে বঞ্চিত হওয়া থেকে, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া থেকে এবং তোমার সকল প্রকার রাগ ও ক্রোধ থেকে পানাহ চাই।"

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِىْ رُشْدِىْ وَاَعِذْنِىْ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ ـ (ترمذى)

"হে আল্লাহ, আমার দীলে তোমার পক্ষ থেকে সঠিক ও হেদায়াত ভিত্তিক জ্ঞান দান কর এবং আমার নফসের অনিষ্টকারিতা থেকে আমাকে রক্ষা কর।"(তিরমিযী)

اَللّٰهُمَّ اَقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَايَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَاتُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَاتُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا مَصَائِبُ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَااَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرُ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَّيَرْحَمُنَا ـ (ترمذى و نسائ)

"হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার ঐ ভীতি দান কর যা আমার ও তোমার নাফরমানীর মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। সেই আনুগত্য দাও যা আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাতে সক্ষম। সেই একীন দান কর, যার কারণে সকল মছিবত সহজ হয়ে যাবে। যতদিন হায়াতে রাখ, আমার চোখ, কান ও শরীরের শক্তিতে বরকত দান কর এবং এটাকে আমাদের উত্তারাধিকারী বানাও। আমাদের উপর যারা জুলুম করছে তুমি তার প্রতিবিধান কর। আর যারা শত্রুতা করছে তাদের উপর আমাদের বিজয় দান কর। আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে কোন মুছিবতে ফেল না। দুনিয়াকে আমাদের কাছে বড় কামনার বিষয় বানিও না। আমাদের জ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানিও না। যারা আমাদের প্রতি রহম করবে না—এমন শক্তিকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না।"—(তিরমিযী, নাসায়ী)

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَاشِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ اٰخِرَتِىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَادِىْ وَاجْعَلِ الْحَيٰوٰتِىْ زِيَادَةً لِىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ - (مسلم)

"হে আল্লাহ, আমার দ্বীনকে নিখুঁত বানিয়ে দাও, যার উপর আমার সকল কাজের ত্রুটিমুক্ত হওয়া নির্ভর করে। আমার দুনিয়াকে পরিশুদ্ধ করে দাও, যার মধ্যে আমার জীবন জীবিকা রয়েছে। আমার আখেরাতকেও নিরাপদ বানিয়ে দাও, যেখানে আমাকে ফিরে যেতে হবে।"—(মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ -

"হে আল্লাহ, তোমার হারাম ঘোষিত জিনিস বর্জন করে হালাল গ্রহণ করাকেই আমার প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট বানিয়ে দাও। তুমি ছাড়া আর সবকিছু থেকে আমাকে বেপরোয়া বানিও দাও।"

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ -

"হে আল্লাহ, তোমাকে তাদের গর্দানে স্থাপন করছি আর তাদের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি।"

কতিপয় ব্যবহারিক দোয়া

শয়নকালের দোয়া ঃ

بِاِسْمِكَ اَللّٰهُمَّ اَحْيَا وَاَمُوْتُ -

"হে আল্লাহ, তোমারই নামে আমার জীবন ও মরণ।"

শয্যা ত্যাগের দোয়া ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ -

"সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্যে, যিনি মরার পরে আমাদেরকে জীবিত করবেন। এভাবে মৃত্যুর পর আবার জীবিত হয়ে তার কাছেই যেতে হবে।"

পেশাব-পায়খানার দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ -

"হে আল্লাহ, সব রকম অপবিত্রতা থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি।"

খাবারের দোয়া ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَاكَاتِ اللّٰهِ ـ

"আল্লাহর নামে, আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকতের আশায়।"

খাবারের পরের দোয়া ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَO

"প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদের খাওয়ালেন, পান করালেন, সর্বোপরি যিনি আমাদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।"

যানবাহনে ভ্রমণের দোয়া ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

"পবিত্রতা ঘোষণা করছি সেই সত্তার, যিনি এসব কিছুকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে এনে দিয়েছেন। অন্যথায় আমরা এসব আয়ত্তে আনতে পারতাম না। এভাবেই আমরা সবাই তার দিকে ফিরে যেতে বাধ্য।"

—(সূরা আয জুখরুফ ঃ ১৩-১৪)

জলযানে ভ্রমণের দোয়া ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌO

"সেই আল্লাহর নামে, যার নির্দেশে এটি চলে ও থামে। অবশ্যই আমার রব ক্ষমাশীল।"—(সূরা হুদ ঃ ৪১)

এভাবে এ ধরনের সবগুলো দোয়াই অর্থবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। বাস্তব জীবনের উপর যার ফলাফল ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে সুদূর প্রসারী। যদি এসবের উপর আমল করা হয় এবং অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়-মন দিয়ে উপলব্ধি করা যায় তবে নিসন্দেহে তার কল্যাণ থেকে আমরা উপকৃত হবো।

আত্মশুদ্ধি ও আত্মসমালোচনা

আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে আত্মসমালোচনার একটা কার্যকর ও সার্থক ভূমিকা রয়েছে। যারা আল্লাহ ও রাসূলের পথে চলে তাদের আত্মপরিশুদ্ধি ও উন্নতি কামনা করে নিয়মিতভাবে আত্মসমালোচনার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

আত্মসমালোচনা মূলতঃ আদালতে আখেরাতে আল্লাহর কাছে যে হিসেব দিতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে তারই পূর্ব প্রস্তুতি। হযরত ওমর (রা) বলেছেন ঃ

"আল্লাহর কাছে হিসেব দেবার আগে তুমি নিজেই নিজের হিসেব নাও।" আমরা বাস্তব জীবনে দেখতে পাই, কোন প্রতিষ্ঠানের হিসেব অডিট করার জন্য ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করার আগে বুদ্ধিমান লোকেরা হিসেবটা নিজেরা ভালভাবে পরীক্ষা-নিরাক্ষা করে নেয়। যাতে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে হিসেবে কোন ভুল-ত্রুটি ধরা না পড়ে। আদালতে আখেরাতে আমাদেরকে হিসেব পেশ করতে হবে এমন এক পরাক্রমশালী সত্তার কাছে, যার আদালতে কেউ তার অনুমতি ছাড়া টু-শব্দটিও করতে পারবে না। সেখানে যাতে হিসেবে আমরা আটকে না যাই এই মনোভাব নিয়ে নিজেদের আমলের হিসেব নেয়া এবং সাধ্যমত প্রতিনিয়ত আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে ধাপে ধাপে উন্নত আমলের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমত্তার দাবী। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

"সে-ই বুদ্ধিমান, যে নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের সাফল্যের জন্য আমল করে।"

আত্মসমালোচনার উপায়

দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টার কার্যক্রমের উপর দিনের শেষের কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে চিন্তা-ভাবনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে আমাদের প্রতিদিনের কাজের যথার্থ মূল্যায়ণ করতে পারি। এভাবে যদি কোন ভুল-ত্রুটি নজরে আসে তাহলে সে জন্যে অনুতাপ-অনুশোচনা করেই শেষ না করে বরং ভবিষ্যতে যাতে এরূপ ভুল-ত্রুটি বা অবহেলা না হয় সে জন্য সংকল্প গ্রহণ করা উচিত। আত্মসমালোচনার এটাই নিয়মিত বা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি।

এছাড়া বাস্তব কাজে-কর্মে যখনই কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তখন তখনই তার জন্যে অনুতপ্ত হয়ে সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া উচিত। এটাকে আমরা আত্মসমালোচনার বাস্তব রূপ হিসেবে ধরে নিতে পারি। এছাড়া কুরআন অধ্যয়ন

এবং হাদীস অধ্যয়নের সময় আমরা পঠিত অংশের আলোকে আত্মসমালোচনা করতে পারি। পঠিত অংশের আলোকে আমার অবস্থান কোথায়, এর দাবী পূরণের দৃষ্টিতে আমি কতটা পেছনে আছি, এর যথার্থ মূল্যায়ণ করে নিজেকে শোধরাবার বা উন্নত করার সিদ্ধান্ত নেয়াই এ ধরনের আত্মসমালোচনার দাবী।

যেমন, সূরায়ে হুজরাতের যে অংশে আন্দাজ-অনুমান করা, পরনিন্দা বা গীবত করা এবং অপরের খুঁত তালাশ করতে বারণ করা হয়েছে, সেই অংশটি পাঠের সময় আমি আমার নিজের খতিয়ান নিয়ে দেখতে পারি, এই দোষ-ত্রুটিগুলো আমার মধ্যে আছে বা নেই। না থাকলে আল্লাহর শোকর। তবে একেবারেই ত্রুটি মুক্ত হওয়া তো কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আপাততঃ যদি মনে হয় যে আমার জানা মতে এসব ত্রুটি আমার মধ্যে নেই, তারপর সতর্কতার জন্যে মনের উপর আরও একটু চাপ সৃষ্টি করতে হবে। যাতে আমার অজান্তে কোন ত্রুটি থেকে থাকলে তা থেকে আমি মুক্ত হতে পারি।

এমনিভাবে হাদীস অধ্যয়নের সময় যদি মুনাফেকীর আলামতের আলোচনা আসে তাহলে আমার বুকে হাত রেখে আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যাতে এই সর্বনাশা ত্রুটি আমার কাছেও ঘেষতে না পারে। এমনিভাবে কবীরা গোনাহগুলোর আলোচনা সামনে আসলে আমাদের মনকে জিজ্ঞেস করা উচিত এর কোন কোনটি আমি এখনো বর্জন করতে পারিনি। ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে করে এসব কবীরা গোনাহের কোন একটিও আমাদেরকে স্পর্শ করতে না পারে।

আল কুরআনের যেসব জায়গায় আখেরাত, বেহেশত, দোযখ তথা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শিত হয়েছে, রাতের নির্জন প্রহরের নফল নামাযে সেই সব আয়াত বা সূরা তেলাওয়াতের মাধ্যমেও আমাদের মন-মগজ এবং বাস্তব জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করা যেতে পারে।

আমরা আত্মসমালোচনার মাধ্যমে যা পেতে চাই তার জন্যে তওবা এবং মুরাকাবার প্রয়োজন হয়। তাই আমরা আত্মসমালোচনার প্রসঙ্গে এসে এই দু'টি বিষয় সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করতে চাই।

তওবা

কোন অন্যায় কাজ হয়ে যাবার পর অনুতাপ-অনুশোচনা করে সেই কাজের জন্যে মাফ চাওয়া এবং সেই অন্যায় কাজ ছেড়ে ভাল কাজে ফিরে আসাকেই তওবা বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

الاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُوْلٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرً رَّحِيْمًا ٥ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا٥(الفرقان : ٧٠ - ٧١)

"কিন্তু যারা তওবা করবে, ঈমান আনবে এবং ভাল কাজ করবে, আল্লাহ তাদের খারাপ কাজসমূহকে ভাল কাজ দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আর যারা তওবা করে এবং নেক কাজ করে আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের তওবাই সত্যিকারের তওবা।"—(সূরা আল ফুরকান ঃ ৭০-৭১)

এখানে তওবার সাথে ঈমান ও নেক আমলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, তওবাকারীকে নতুন করে ঈমানের ঘোষণা দিতে হয়। আর তওবার যথার্থতার পরিচয় হল নেক আমলের তৌফিক হওয়া। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যখন কোন কবীরা গোনাহ করে তখন তার মধ্যে ঈমানী শক্তি প্রায় অকার্যকর হয়ে থাকে। সেই জন্যেই তওবাকারীকে নতুন করে ঈমানের ঘোষণা দিতে হয়। হাদীসে রাসূলে উল্লেখ আছে, চোর যখন চুরি করে তখন সে মু'মিন থাকে না, জেনাকারী যখন জেনা করে তখন সে মু'মিন থাকে না। অর্থাৎ তখন তার মধ্যে ঈমানী চেতনা কার্যকর থাকে না। সূরায়ে ফুরকানের ৭১ নম্বর আয়াতের মধ্যে তওবা প্রসঙ্গে আমরা দু'টো জিনিস পাই। এক, সেই ব্যক্তির তওবাটাই যথার্থ তওবা যে তওবার পর খারাপ কাজ বাস্তবেই বর্জন করে এবং ভালো কাজে আত্মনিয়োগ করে। দুই, উক্ত আচরণ শুধু তওবার যথার্থতাই প্রমাণ করে না, এটা আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা কবুল হওয়ার একটা আলামতও বটে।

প্রকৃতপক্ষে আত্মসমালোচনার মাধ্যমেও আমরা এই জিনিসটাই পেতে চাই। তাই কথাটাকে আমরা এভাবেও বলতে পারি, আত্মসমালোচনার মনোভাব নিয়ে, নিজেকে সংশোধনের সংকল্প নিয়ে, তওবা করলেই সে তওবা যথার্থ বা ফলপ্রসু হয়। অপর দিকে তওবার স্পিরিট নিয়ে আত্মসমালোচনা করলেই সে আত্মসমালোচনা যথার্থ হয়। এবং আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে একটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

তওবার যথার্থ গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্যে আমরা এখানে আল কুরআনের কয়েকটি আয়াত এবং আল্লাহর রাসূলের কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি।

وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ○

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা সবাই তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আস, যাতে করে তোমরা সফল হতে পার।"—(সূরা আন নূর ঃ ৩১)

اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○

"অতপর তারা কি আল্লাহর দিকে তওবা করে ফিরে আসবে না এবং তাদের গোনাহসমূহের জন্যে ক্ষমা চাইবে না ? অথচ আল্লাহ তো ক্ষমাশীল এবং মেহেরবান।"—(সূরা আল মায়েদা ঃ ৭৪)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ط عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لا يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ج نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ج اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ○

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা খালেস দিলে তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আস। আশা করা যায়, আল্লাহ তোমাদের ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করে দেবেন এবং সেই জান্নাতে স্থান দেবেন, যার পাদদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে। সেই বিচারের দিনে আল্লাহ তার নবীকে এবং সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে লজ্জিত করবেন না। সেদিন তাদের সামনে ও ডাইনে নূর সম্প্রসারিত হবে। তারা বলবে, হে আমাদের রব, আমাদের নূরকে পূর্ণরূপে বিকাশ কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান।"
—(সূরা আত তাহরীম ঃ ৮)

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا○ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ج حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ

اِنِّىْ تُبْتُ الْئٰنَ وَلاَ الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ط اُوْلٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

"আল্লাহর কাছে তাদের তওবাই সত্যিকারের তওবা যারা অজ্ঞতাবশতঃ খারাপ কাজ করার সাথে সাথেই তওবা করে ; আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন। আল্লাহতো জ্ঞানী এবং বিজ্ঞ। তাদের তওবা নয়, যারা অবিরাম খারাপ কাজ করতেই থাকে এবং মৃত্যু যখন দোরগোড়ায় এসে হাজির হয় তখন বলে, এখন আমি তওবা করলাম। আর না তাদের তওবাকে তওবা বলা যায়, যারা কুফরী কাজে লিপ্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। এসব লোকের জন্য আমি কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নির্দিষ্ট করে রেখেছি।"—(সূরা আন নিসা ঃ ১৭-১৮)

عَنْ اَسْرَارِ بْنِ يَسَارِ الْمَزَنِيْ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ فَاِنِّىْ اَتُوْبُ الْيَوْمَ مِائَةَ مَرَّةٍ - (مسلم)

হযরত আসরার ইবনে ইয়াসার আল মাজানী (রা) বলেন ঃ "রাসূল (সা) বলেছেন, হে লোক সকল, তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আমি দিনে একশত বার তওবা করে থাকি।"—(মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسِ الْاَشْعَرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَبْسُطُ يَدَهٗ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِىْءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِىْءُ النَّهَارِ حَتّٰى تَطْلَعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا - (مسلم)

"হযরত আবু মূসা আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস আল আশয়ারী থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা দিনের অপরাধীদের ক্ষমা করার জন্য রাতে এবং রাতের অপরাধীদের ক্ষমা করার জন্য দিনে ক্ষমার হাত প্রসারিত করে রাখেন।" —(মুসলিম)

عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ ـ (مسلم)

"হযরত আবু আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ "মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার তওবা কবুল করেন।"–(তিরমিজি)

মুরাকাবা

আল্লাহর একটি অন্যতম গুণবাচক নাম রকিব। যার অর্থ পর্যবেক্ষণ। যিনি আমাদের প্রত্যেকের কাজকর্ম প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। আবার আমাদের আমল রেকর্ডের জন্যে যেসব ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন তাদের কেউ আল্লাহ তা'আলা রকিব নামে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরায়ে ক্বাফ এ বলেন ঃ

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ○ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ○

"দু'জন লেখক তাদের ডানে বামে বসে সবকিছু রেকর্ড করে চলেছে। তাদের মুখ থেকে এমন কথাই বের হয় না যা রেকর্ড করার জন্যে একজন সজাগ সচেতন প্রহরী উপস্থিত না থাকবে।"—(ক্বাফ ঃ ১৭-১৮)

এখানে প্রহরায় বা পর্যবেক্ষণে ফেরেশতা নিয়োজিত থাকার কথাই আল্লাহ উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু সূরায়ে নিসাতে আল্লাহ তা'আলা নিজেকেই রকিব বা সদা পর্যবেক্ষক নামে অবহিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا○

"হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের সেই রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদের একটি জীবন থেকে সৃষ্টি করেছেন। সেই একটি জীবন থেকে প্রথমে তার জীবন সাথী সৃষ্টি করেছেন। অতপর তাদের উভয়ের মাধ্যমে অসংখ্য নারী-পুরুষ দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ছে। ভয় কর সেই আল্লাহকে, যার নামে তোমরা পরস্পরের কাছে অধিকার দাবী করে থাক। আর ভয় কর আত্মীয়তা বিনষ্ট করা থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছেন।"—(সূরা আন নিসা ঃ ১)

আধুনিক আরবীতে কাজ তদারককারীদের মুরাকেব বলা হয়। এই মুরাকেবার সহজ-সরল অর্থ আমরা এটাই করতে পারি যে, "আল্লাহ আমাদের যাবতীয় কার্যক্রম প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন বা পর্যবেক্ষণ করছেন—আবার

ফেরেশতা দিয়েও পর্যবেক্ষণ করাচ্ছেন। এই অনুভূতি মনে-মগজে সজাগ সচেতন রেখে কাজ আনজাম দেবার নামই সত্যিকারের মুরাকাবা। আমাদের আত্মসমালোচনার মুহূর্তে এই মনোভাব সৃষ্টি হলে, আমাদের আত্ম-সমালোচনাকে মুরাকাবায় পরিণত করতে পারি। অন্য কথায়, নিজের আমলের খতিয়ান নেবার ও মূল্যায়ণ করার মানসে আত্মসমালোচনা না করে নিছক কোন অর্থহীন ধ্যান-তপস্যার নাম মুরাকাবা হতে পারে না।

অর্থাৎ, প্রকৃত মুরাকাবা হল, আল্লাহকে প্রতিটি কাজের তদারককারী, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণকারী মনে করে প্রতিটি মুহূর্তে চলার চেষ্টা করা। যাতে ব্যক্তির মধ্যে এই মর্মে ইয়াকীন সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তার সব ব্যাপারে ওয়াকেফহাল আছেন। তার সকল গোপন রহস্যও তার জানা আছে। তার যাবতীয় কার্যক্রমে তিনি নজর রাখছেন। আর একজন মানুষের মধ্যে এই অবস্থার সৃষ্টি হয় আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার মাধ্যমে এবং আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর জিকির করার মাধ্যমে। তবে, এই জিকির মানুষের মনগড়া তরিকার জিকির নয় বরং আল্লাহর রাসূলের শিখনো জিকিরের মাধ্যমে।

রাসূলের শিখানো জিকিরের প্রথম উপায় নামায কায়েম করা। দ্বিতীয় উপায় বুঝে কুরআন তেলাওয়াত করা। তৃতীয় উপায় বিভিন্ন কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় আজকারে মাসনুনা ও আদইয়ায়ে মাছুরা পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা।

আজকারে মাসনুনা বলতে ঐসব জিকিরকে বুঝায়, যেগুলো আল্লাহর রাসূল শিখিয়েছেন। যেমন, ফরয নামায শেষে 'সবুহানাল্লাহি ওয়াল আমানিল্লহি' এবং 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করা। তাছাড়া 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' বেশী বেশী পাঠ করা। এই পর্যায়ের তাসবিহ ও তাহলিলগুলোকে আজকারে মাসনুনা বলা হয়।

আদইয়ায়ে মাসুরা বলতে বুঝায়, আল্লাহর রাসূলের শিখানো দোয়া। "আদইয়া" দোয়ার বহুবচন। "মাসুরা" অর্থ আসার বা হাদীসের দ্বারা সাব্যস্ত। যেমন—খাবার আগে, খাবার পরে, ঘুমাবার আগে, ঘুম থেকে উঠার পরে, পায়খানায় যাবার আগে ও পরে প্রভৃতি সময়ের জন্য আল্লাহর রাসূল কিছু বিশেষ বিশেষ দোয়া শিখিয়েছেন। তাছাড়া আল্লাহর কাছে কোন ভাষায় কখন কিভাবে দোয়া করলে আল্লাহকে বেশী খুশী করা যায় এই পর্যায়ে রাসূলের শিখানো অসংখ্য দোয়া আছে।

এরূপে সঠিকভাবে নামায কায়েম করে, যথার্থভাবে কুরআন তেলাওয়াত করে এবং আজকারে মাসনুনা ও আদইয়ায়ে মাসুরার অনুশীলন করে মনের ঐ

অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যে অবস্থায় সবসময়ের জন্য আল্লাহকে তার উপর রাকিব বা পর্যবেক্ষক মনে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ط

"হে নবী! তুমি যে অবস্থায় থাক না কেন এবং কুরআন হতে যা কিছু শোনাও—আর হে লোকেরা! তোমরাও যা কিছু কর—এসব অবস্থায়ই আমরা তোমাদিগকে দেখতে ও লক্ষ্য করতে থাকি।—(সূরা ইউনুস ঃ ৬১)

রাসূলের ঘোষণা ঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ ـ

"এভাবে ইবাদত-বন্দেগী কর যেন স্বয়ং আল্লাহকে দেখছ, যদিও তুমি দেখতে পাও না। তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।"(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত সুফিয়ান ছাউরী বলেন ঃ "তোমাকে সেই সত্তার মুরাকাবা করতে হবে যার কাছে গোপন বলে কোন কিছুই নেই। তোমাকে তার কাছেই আশা-প্রত্যাশা করতে হবে। তিনি সব আশা পূরণের মালিক। তোমাকে তাকেই ভয় করতে হবে। যিনি শাস্তির মালিক।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ "আল্লাহর মুরাকাবা কর।' লোকটি এ নির্দেশ শুনে জানতে চাইল ঃ 'মুরাকাবা কি?' উত্তরে হযরত ইবনে মুবারক বললেন ঃ 'তুমি সবসময় মনের এ অবস্থা নিয়ে চল যেন আল্লাহকে দেখছ।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দিনার থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন ঃ "আমি আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের (রা) সাথে একদিন মক্কার দিকে রওয়ানা হয়ে পথে বিশ্রাম নেয়ার সময় একজন বকরীর রাখালের সাথে দেখা হলো। রাখালটি পাহাড়ে বকরী চরাচ্ছিল। হযরত ওমর রাখালকে বললেন, আমাদের কাছে একটি বকরী বিক্রি কর। রাখাল উত্তরে বলল, সেতো মালিকের চাকর মাত্র, সে কি করে বিক্রি করবে। তখন ওমর (রা) বললেন ঃ 'তোমার মালিককে বলবে একটা বাঘে খেয়ে গেছে।' তখন চাকরটি বলল ঃ 'আল্লাহ কোথায়?' সাথে সাথেই হযরত ওমর কেঁদে ফেললেন। অতপর ঐ চাকরের মালিকের কাছে গিয়ে তার কাছ থেকে চাকরটাকে খরিদ করে নিয়ে আযাদ করে দিলেন।"(মিনহাজুল মুসলিম)

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত
লেখকের অন্যান্য বইসমূহ

কুরআনের আলোকে মুমিনের জীবন
ইসলামী আদাবে জিন্দেগী
ইসলামী আন্দোলন, সমস্যা ও সম্ভাবনা
মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য
বক্তৃতামালা
ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ
দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব
গণতন্ত্র গণবিপ্লব ও ইসলামী আন্দোলন